প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা ১৯৮৫

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
PRESENTED
6 JAN 1987
CALCUTTA

093.7
P926M.

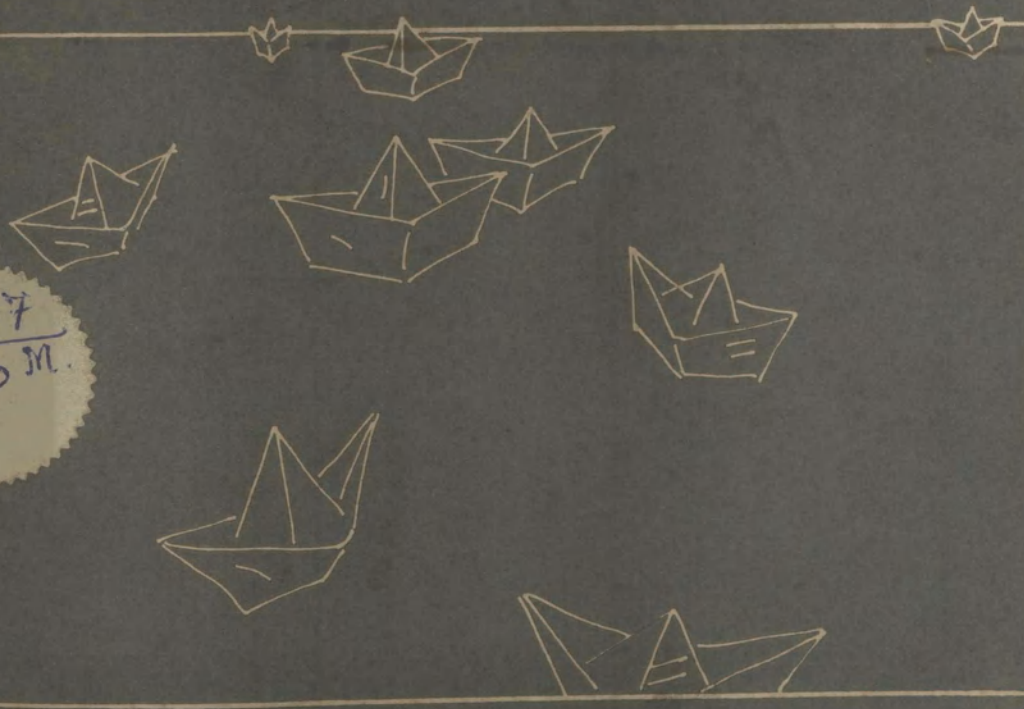

093.7
P926M

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

খণ্ড ৫৬ ১৯৮৫-৮৬

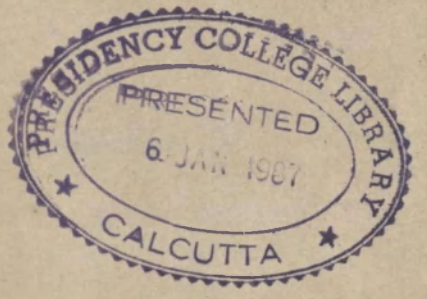

Library Copy

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক :
সুকান্ত চৌধুরী
গৌরীশঙ্কর ঘটক

প্রকাশন-সচিব :
চান্দ্রেয়ী নিয়োগী

সম্পাদক :
বৃন্দা বসু
অঞ্জন গুহঠাকুরতা

প্রচ্ছদ এঁকেছেন

সমীর রায়

অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং পিপল্‌স লিটল প্রেস, ৪ হিদারাম ব্যানার্জি লেন,
কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়	১	মুখবন্ধ
	২	সম্পাদকীয়
	৫	কলেজ নিয়ে ভাবনা
	৬	কলেজ নিয়ে ভাবনা : কেন প্রকাশিত হল না
ধ্রুব গুপ্ত	৭	নামিবিয়া
মালিনী ভট্টাচার্য	১০	ক্রীতদাসত্বের উত্তরাধিকার ও আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নারী : এঞ্জেলা ডেভিস
প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত	১৩	প্রাচীন বাংলার দুটি চিঠি
বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য	১৮	মৃত্যু সমদর্শী
বার্ণিক রায়	১৮	সূর্যের কালো রক্ত
অসীম রতন ঘোষ	১৯	বাংলা সাময়িকপত্রে চিত্রকলার ক্রমবিবর্তন
অনির্বাণ ময়ূখ সেনগুপ্ত	২২	প্রযুক্তি প্রসঙ্গ : তৃতীয় বিশ্ব ও পশ্চিমী মারীচ
অভিজিৎ দত্ত	২৬	তিনটি কবিতা
শম্পা সেন	২৭	বাংলার কৃষক সংগ্রামে গান
অপূর্ব সাহা	৩১	শুভবুদ্ধি সংক্রান্ত আর যা কিছু
সৌম্য দাশগুপ্ত	৩৫	তিনটি কবিতা
	৩৬	বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজনীতি
স্বপন রায়	৩৯	পথিক তাকেই বলো
কৃত্তিবাস রায়	৩৯	দুটি কবিতা
	৪০	কলেজ প্রাসঙ্গিকী
	৪৩	প্রকাশন সচিবের প্রতিবেদন

Contents

Subodh Chandra SenGupta	1	Reminiscences
Prasanta Roy	4	Aggression, Children and Socialization
Chandreyee Niyogi	6	Comments on the "Challenge of Education"
Suhit K. Sen	10	The Poetry of Thom Gunn
Sudipto Sen	13	Still The December Sky
Kinsuk Mitra	14	Notes From An Indian Jungle
Srimati Basu	17	Thy Will Be Done : A Story of Action
Udayan Mitra	20	The Pebble
Kaushik Nag	22	WUI (Westernised Urban Intellectuals)
Udayan Majumdar	23	The Eden Hindu Hostel : A Sardonic Celebration
	25	The Street Where We Live
	27	Editorial

HINDI

Sanjay Roy	1	Acharya Ramchandra Shukla : Ek Sarvekhsan
Namita Sanganeria	6	'Nirala', athacha Tulsi

মুখবন্ধ

১৯৮৫ সনের প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা প্রকাশিত হল। প্রকাশের বিলম্বের মুখ্য কারণ অর্থাভাব। বর্তমান বরাদ্দ সামান্য অর্থে কলেজ পত্রিকার প্রকাশনা অসম্ভব। সরকারী অর্থ সাহায্য আসু বাড়ানোও অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাই বছরের পর বছর প্রতীক্ষা ও ধৈর্য্য—ফল পত্রিকার প্রকাশনা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হওয়া।

বর্তমান ছাত্রসংসদ ও পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর সুসংগঠিত পরিকল্পনা, নিষ্ঠা, পরিশ্রমের ফলে এই পত্রিকার প্রকাশনা সম্ভব হল। অর্থাভাব ছাড়া বহু বাধা প্রকাশনার বিঘ্ন ঘটায়, যেমন সঠিক মানের কাগজ সংগ্রহ, বৈদ্যুতিক বিভ্রাট প্রভৃতি। সকল বাধাবিপত্তির মধ্যে পত্রিকার মান ঠিক রাখার চেষ্টা অক্ষুণ্ণ রেখে অভিনবত্বের সংযোজন করার চেষ্টা হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য সর্বজনবিদিত। ঐতিহ্য ও উৎকর্ষে, বিষয়বস্তুর পরিবেশনায় পত্রিকাটি অনন্য। এই পত্রিকার প্রকাশনা যাতে নিয়মমত ও সঠিক সময়মত হয় সেই জন্য সকল শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, ছাত্র ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা, নির্দেশনা ও গঠনমূলক সমালোচনার জন্য। সকলকে আমার সাগ্রহ নিবেদন, এই ঐতিহ্য মণ্ডিত ও গৌরবময় বিদ্যায়তনের পত্রিকার মান উন্নততর করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে সামিল হন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদকমণ্ডলী ও পরিচালকদের অধিকাংশই আজ বাংলাদেশের মুখোজ্জ্বলকারী শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবীন উদ্যমে পত্রিকায় নূতনত্ব আনাই আমাদের লক্ষ্য হোক।

অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ
প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলকাতা ৫/৩/১৯৮৬

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
PRESENTED
6 JAN 1987
CALCUTTA

সম্পাদকীয়

কলেজ পত্রিকা : তথাকথিত সৃজনশীলতা অথবা সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ফোরাম

১৯১৪ সালের প্রথম সংখ্যা থেকে ১৯৮৪তে প্রকাশিত ৫৫তম সংখ্যার প্রায় প্রতিটিতেই প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছে অনেকখানি সাহিত্য পত্রিকার আঙ্গিক নিয়ে। প্রাক্-স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনোত্তর যুগে সাহিত্য রচনায় বিষয়গত বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন পত্রিকাতে প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি অনেকটা বহিরঙ্গের। আন্তরিকভাবে আঙ্গিক বা উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাবেকি ভাবের খুব একটা পরিবর্তন পত্রিকার প্রায় কোন সংখ্যাতেই নজরে পড়ে না (কেবল একটি দুটি সংখ্যা ছাড়া যার কোন কাঁপই প্রাপ্তব্য নয়)।

ফলে এই কলেজের পত্রিকার প্রকাশ অনেক সাহিত্য রসিক-দের কাছে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। প্রাক্তন ছাত্রদের অনেকের কাছেই কলেজ পত্রিকা নস্টালজিয়ার খোরাক, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য আর ঝিমিয়ে পড়া (মৃত ?) এক কাল্পনিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে। 'কালি কলম' বা 'শনিবারের চিঠি'র মতো কলেজ পত্রিকা বৎসরান্তরে কলেজের উঠতি লেখকদের গল্প কবিতা প্রবন্ধের এক লম্বা ফর্দ নিয়ে চিরকাল হাজির হয়েছে। পুরোনো দিনের অনেক দিক্‌পাল ছাত্রদের (যাঁরা অনেকেই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক কবি বা প্রাবন্ধিক) সৃজনশীলতার ক্ষেত্রভূমি হয়ে কলেজ পত্রিকা এক সময়ে তো হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি সাহিত্যের কাগজ। কালানুক্রমে তাই কলেজ পত্রিকার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে নিতান্তই উদীয়মান কবি সাহিত্যিকদের দাঁড়ানোর প্ল্যাটফরম তৈরী করা।

অথচ এর উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব তো শুধু তা নয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তখনকার অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেমস্ লিখেছিলেন যে পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্য কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও হতাশার কথা জানতে। সে দিকটা ৫৫টি সংখ্যার কোনটাতেই প্রকাশিত হয় নি। প্রথম দিকে পত্রিকার প্রকাশ নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হত। বেশ কিছুকাল ধরে তারও ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় চার বছর অপ্রকাশিত থাকার কথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বছর (১৯৭৬-৭৭ বা ৭৮-৮১) পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি। তার একমাত্র কারণ বোধহয় অর্থাভাব। দু-এক বছরের অর্থ জমিয়ে কোনো মতে কলেবর ও বাহুল্যের সংযম মেনে পত্রিকা বেরিয়েছে। ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা হয়েছে প্রকাশনার ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। আর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার দিকটা এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে তার ধারাবাহিক প্রকাশ দু একটি সংখ্যা ছাড়া একেবারেই নজরে আসে নি।

তা ছাড়া একবার প্রকাশিত হবার পর অপ্রকাশনার বছর গুলিতে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তার জন্ম ও মৃত্যু ঘটে গেছে। পরবর্তী পত্রিকায় তার কোন ছাপও লক্ষ্য করা যায় নি। করা সম্ভব নয়, কেননা সহজ কারণেই পরবর্তীকালের পত্রিকা সে সময়কে ধরতেই প্রয়াসী হবে বিশেষভাবে, অতীতকে প্রতিফলিত করতে নয়। কাজেই প্রধানত সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে, বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজ-পত্রিকা উন্নতমানের লেখার প্রকাশ ভিন্ন অন্য কোনভাবে উল্লেখযোগ্য একথা স্বীকার করা শক্ত।

এবারকার পত্রিকা কিন্তু অনেক নিয়ম কানুন (এবং ঐতিহ্য) ভেঙে উপস্থিত হচ্ছে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে এবার বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়েছে। পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে এটা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারকে জানিয়ে 'ভরসা' ছাড়া কোন ফল পাওয়া যায় না। অনেক অনুরোধ, অনুযোগ বৃথা গেছে। অনেক আগেই বিজ্ঞাপন

প্রকাশ করা উচিত ছিল। প্রাক্তন ছাত্ররা কেন তা করেন নি তা ভাবা শক্ত। অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তি বলবেন প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার কৌলীন্য এতে কিছু কমল। এ যুক্তিতে কান দিলে পত্রিকা বের করা সম্ভব হত না। কাজেই বিজ্ঞাপন কেন নেওয়া হল তা নিয়ে কৈফিয়ৎ দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং প্রশ্ন ওঠা উচিত এতকাল কেন বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় নি? অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, ধারাবাহিকতা বহনের জন্য আজ যা অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে, প্রাক্তন ছাত্রদের সে বিষয়ে সচেতনতা থাকলে কয়েকটি সংখ্যা অপ্রকাশিত থাকত না। আশা করছি এবারকার এই নিয়মভঙ্গ কলেজ পত্রিকাকে আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্ত করে তার বাৎসরিক প্রকাশের পথকে সুগম করবে।

কলেজ পত্রিকাটা কিসের জন্য? কলেজে প্রবেশ করবার সময়েই এ প্রশ্নটা মাথায় ঢুকেছিল, কিন্তু প্রবল হয়ে দাঁড়ালো পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে। পত্রিকার প্রকাশনা সংক্রান্ত জটিলতার প্রতি পদে কর্তৃপক্ষের নজরদারি, বিষয় নির্ধারণে উপদেশ দান—এ সবই অনেকটা পাহারাদারের কাজের মতো হচ্ছে। আমরা চাইছি কলেজ পত্রিকা হয়ে উঠুক কলেজের ছাত্রদের আশা হতাশার প্রতিচ্ছবি। কর্তৃপক্ষ চাইছেন পত্রিকা হোক মহান ঐতিহ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তাই সমাজ রাজনীতি নয়, শৌখিন সাবেকি সাহিত্য চর্চার দিক থেকে এতটুকু সরতে উৎসাহী নন তাঁরা। অথচ বর্তমান সময়টা অন্তত এমন, ছাত্রদের নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইচ্ছামত কলমের খোঁচায় ও বিলের বা আইনের পরিবর্তনে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে; শিক্ষা বিষয়ে তাদের মতামত কেউ শুনেছেও না। বেশ অনুভব হচ্ছে কলেজ পত্রিকার বর্তমান যা কাঠামো তাতে খোলামনে ছাত্রদের বক্তব্য কর্তৃপক্ষ ছাপাতে দিতে নারাজ। ছাত্র আন্দোলনের স্বার্থে যে কাজের জন্য ছাত্র সংসদ কলেজ পত্রিকাকে ব্যবহার করতে পারে সে দিকটা সচেতনভাবে আটকাতে চাইছেন কর্তৃপক্ষ। আমাদের বক্তব্য কলেজ পত্রিকাই কি ছাত্রদের সমস্যা, অভিযোগ জানার সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম নয়? যদি কর্তৃপক্ষ বা সরকার ছাত্রদের দাবীদাওয়া নিয়ে অকারণ টালবাহানা করেন বা উদাসীন থাকার ভান করেন, সেক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ছাত্ররা পৌঁছবে কি করে? কলেজ কর্তৃপক্ষ চিরকাল এই ব্যাপারটায় ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে চলেছেন। তাই সব সময়ে এই পত্রিকায় একটা নির্বিরোধী আপোষ করার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। অথচ এমন নয় ছাত্ররা তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে উৎসুক নয়। অন্তত এ কলেজের সচেতন ছাত্রদের (সংখ্যায় যত নগণ্যই হোক তারা) পরিচালিত আন্দোলন সর্বদাই ছাত্র স্বার্থের দিকে চেয়ে হয়েছে, রাজনৈতিক দাদাদের নির্দেশিত পথে নয়। কিন্তু সে যাই হোক ছাত্রদের বক্তব্য কাগজে কখনোই প্রবেশ করতে পারে নি কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে অথবা তাদের সচেতন বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে। তার প্রধান কারণ এ পত্রিকার প্রকাশক ছাত্রসংসদ নয় কলেজ অধ্যক্ষ (যদিও সম্পাদকমণ্ডলী ছাত্রসংসদ কর্তৃক নির্বাচিত এবং অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত)। পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ প্রায় সবসময়েই সেন্সরের কাঁচি হাতে তৈরী। আর অতি সচেতন এবং রক্ষণশীল কেউ সে কাজে সব থেকে উপযুক্ত। ফলে কোন অভাব অভিযোগ সরাসরি তো নয়ই, এমন কি পরোক্ষভাবে ও প্রকাশ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। যদিও এমন নয় যে সমস্ত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গণই রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল। এমন অনেক ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন যাঁরা ছাত্র স্বার্থের কথা সর্বদাই ভাবেন। কিন্তু বর্তমান কাঠামোতে এই সব প্রগতিশীল শিক্ষকেরা প্রশাসনিক জটিলতার জন্য এবং পেশাসংক্রান্ত কারণে ইচ্ছে থাকলেও হাত-পা বাধা হয়ে থাকেন। ফলতঃ দেখা যায় যে কলেজ পত্রিকাতে এই সব অভাব অভিযোগ প্রকাশ করার 'শোভনতা', 'সার্থকতা' নিয়ে নানা প্রশ্নের কূটকচালে পুরো ব্যাপারটাই বানচাল হয়ে যাচ্ছে।

আসলে তাঁদের মোদ্দাকথা হোলো, পত্রিকাকে হতে হবে তথাকথিত সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রভূমি। কলেজের উঠতি কবি সাহিত্যিকদের মনোরাজ্যে বসবাসকারী ভাবনা-চিন্তার, এমনকি অর্থহীন বা আপাত দুর্বোধ্য সৃষ্টিরও, প্রসব ঘটাতে পারলেই পত্রিকায় সব দায়দায়িত্ব শেষ। এ ব্যাপারটা এতদিন পর্যন্ত চলেছে এবং বেশ জোরের সঙ্গেই। এখনও কলেজ পত্রিকা ছাত্রদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ফোরাম নয়, কর্তৃপক্ষের বিগ্ ব্রাদার মনোভাব থাকলে কোনও দিনও তা সম্ভব হবে না।

আমার মনে হয় কলেজ পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্ব ছাত্র-সংসদের উপর অর্পণ করা উচিত। তাতে প্রকাশনার সব দায় দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে আসত হলে প্রকাশিত অভাব অভিযোগের দায়ও তাদের কাঁধেই চাপবে। ফলে অধ্যক্ষ বা শিক্ষকদের চাপ বা ঐ ধরনের কোন প্রতিবন্ধকতা আমাদের কাজকে ব্যাহত করতে পারবে না। ছাত্রদের সাহিত্যচিন্তা প্রকাশের প্রচুর সুযোগ সুবিধা এ কলেজে বর্তমান। বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা, এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে প্রকাশিত পত্র পত্রিকায় তাদের সাহিত্যচর্চার সুযোগ প্রচুর। কলেজ পত্রিকাতেও অল্প কিছু সাহিত্যচর্চা চলতে পারে মাত্রা মেপে। কিন্তু ছাত্রদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশের আর কোন মাধ্যম আছে বলে আমার জানা নেই। এ কলেজের কোনও কমিটিতেই ছাত্ররা স্থান পায় না। Academic, Library, Admission প্রভৃতি সব কমিটিতে ছাত্রদের কোনও বক্তব্য শোনা হয় না। Teachers' Council এবং Students' Union একই প্রকার সংস্থা হলেও কলেজের প্রশাসনে পরোক্ষভাবে Teachers' Council-এর বক্তব্যই জোরালো ভাবে শোনা যায়, ছাত্রসংসদের নয়। অনেকে বলবেন ছাত্ররা আসে কলেজে পড়তে, প্রশাসনে তাদের বক্তব্য শোনার প্রয়োজন কোথায়? কিন্তু প্রশাসন যদি দিনের পর

দিন ছাত্রস্বার্থ বিরোধী কাজকে প্রশ্রয় দেন বা নিজেরাই করতে থাকেন তবে ছাত্ররা নীরব থাকবে কি করে? এমতাবস্থায় ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থে কলেজ পত্রিকাকেই ফোরাম হিসাবে দাঁড় করাতে হবে।

ভবিষ্যতের কথা জানা নেই, তবে এইবার অন্তত সহানুভূতিশীল ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে কলেজ পত্রিকাকে ছাত্রদের ফোরাম হিসেবে উপস্থিত করার সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা কিভাবে নিচ্ছেন তা দেখার মতো উৎসাহ বা ইচ্ছে আমাদের নেই। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজনীতি প্রভৃতি লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। আমরা মানি বা না মানি, প্রেসিডেন্সি কলেজ শুধুমাত্র এখনকার ছাত্র শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের নয়। মর্যাদা পাক আর না পাক, প্রেসিডেন্সি পশ্চিমবাংলার শিক্ষাজগতের পুরোধা। এখানকার ছাত্ররা পারে সরকার বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করতে। এখানকার ছাত্রদের সেই সাহস আছে যা নিয়ে তারা প্রেসিডেন্সির সমস্যাকে কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করে সাধারণ শিক্ষাসমস্যা হিসাবে উপস্থাপিত করতে পারে। ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্সিয়ানদের কাছ থেকে সেই বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রত্যাশা নিয়েই এই সংখ্যার প্রকাশ।

যাদের সাহায্য ছাড়া পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হত না তাদের সকলের নাম করতে গেলে বিরাট তালিকা হয়ে যাবে। তবু যাদের নাম না করলে নয়—অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী ও অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক। এঁদের সস্নেহ উপদেশ ও সহযোগিতায় পত্রিকা প্রকাশের অনেক জটিলতা কাটিয়ে ওঠা গেছে অতি সহজে। এজন্য দুজনকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যক্ষ অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়কে পত্রিকা প্রকাশে ছাত্রদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য। বন্ধুদের মধ্যে সুমিত চৌধুরী, কৌশিক নাগ, শিবব্রত গুণ, অমিত চৌধুরী, পার্থ সেন, অভিজিৎ দত্ত, ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদার্হ। সম্পাদনার জন্য চান্দ্রেয়ী ও বৃন্দাকে ধন্যবাদ দেওয়া অর্থহীন। আর একজন যার সাহায্য ছাড়া এ সব কথা শুধু কাগজে লেখা হয়েই থাকত—সেই সুবীরদা সুবীর পোদ্দারকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অঞ্জন গুহঠাকুরতা

কলেজ নিয়ে ভাবনা

কলেজ নিয়ে ভাবনা : কেন প্রকাশিত হল না

কলেজের সাম্প্রতিক সমস্যা, সমস্যার সম্ভাব্য কারণ ও কলেজের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারী শ্রেণীর মধ্যে সুস্থ ও কার্যকরী আলোচনার অবকাশ কেন গড়ে উঠছে না এই বিষয়ে ছাত্রদের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক একটি লেখা এসেছিল। এই লেখাটি প্রকাশ করার ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে মতানৈক্য হয়। কেউ কেউ মনে করেন লেখাটি কলেজ পত্রিকায় প্রকাশ করাটা অশোভন হবে, কারণ ছাত্ররা কোনো অবস্থাতেই শিক্ষকদের অথবা কলেজ প্রশাসনকে সমালোচনা করে কলেজ পত্রিকার মর্যাদা হানি করতে পারে না। অন্যপক্ষ মনে করেন যে কলেজ সংক্রান্ত সমস্যা ও সে বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য কলেজ পত্রিকার বাইরে ছাত্রদের আর কোন ফোরাম না থাকায় লেখাটি কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। তবে কলেজ যে বহু সমস্যায় জর্জরিত এবং সে বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত হন। তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকরা প্রস্তাব দেন যে এই লেখাটি প্রকাশ করার আগে শিক্ষক সমিতির মতামত জানা দরকার ; কেননা ছাত্রদের অভিযোগগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতই গুরুতর যে শুধু মাত্র একটি লেখা প্রকাশ করে এ ধরনের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বরং ছাত্র শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার একটি অবাধ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াটাই আশু প্রয়োজন। সম্পাদকমণ্ডলীর ছাত্র সদস্যরাও যেনতেন প্রকারে অভিযোগ জানানোর চাইতে অভিযোগ সমাধানের প্রয়োজনটাকেই বড় বলে মনে করে। তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির কাছে লেখাটি উপস্থাপন করে তাঁদের মতামত জানতে চান।

শিক্ষক সমিতির অধিবেশনে লেখাটির প্রকাশ বা অভিযোগগুলি সমাধানের পথ সম্বন্ধে আপাত কোন সুরাহা হয় নি। এই সভার পর অবশ্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয়। কিন্তু এই কমিটি সম্বন্ধে ছাত্ররা এখনো কিছুই জানতে পারে নি। যে সব সমস্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিযোগ সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে কলেজ পত্রিকা সম্ভবত এ বছরে আর প্রকাশ করা যাবে না। এই লেখাটির প্রকাশকে কেন্দ্র করে কলেজ পত্রিকার কাজে ছাত্র ও সহানুভূতিশীল শিক্ষকদের মিলিত প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হোক এটাও আমরা চাই না। জোর করে লেখাটি প্রকাশ করলেই যে সমস্যাগুলির আশু সমাধান হবে তাও নয়। সুতরাং এই পত্রিকায় "কলেজ নিয়ে ভাবনা" শীর্ষক লেখাটি প্রকাশ করা হল না।

এই লেখাটিতে যে সব সমস্যার কথা উঠেছে সেগুলি সম্বন্ধে ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনেকেই ওয়াকিবহাল বলে মনে হয়। এ অবস্থায় এই ধরনের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ জ্ঞাপন ও আলোচনার ক্ষেত্র এ মুহূর্তে গড়ে না উঠলে আমাদের কলেজ ভবিষ্যতে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কলেজ পত্রিকা ছাড়া এরকম কোন ক্ষেত্র কলেজে এখন নেই। এই ধরনের অন্য একটি ফোরাম গড়ে না উঠলে কলেজ পত্রিকায় অভিযোগ ও আলোচনার স্থান হবে না কেন এ নিয়ে বোধ হয় আমাদের সকলেরই চিন্তা ভাবনা করা দরকার।

নামিবিয়া

ধ্রুব গুপ্ত

রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে এক ধরনের আত্মপ্রসাদকে প্রশ্রয় দেবার প্রবণতা থেকে যায়। আফ্রিকা-দক্ষিণের কৃষ্ণাঙ্গের ওপর অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা যখন সোচ্চার হই, তখন একটা সন্দেহ থেকে যায় যেটা সম্ভবত অমূলক নয়; সেটা হল এতে আমরা প্রকৃতপক্ষে ঐ অত্যাচারিতদের প্রতি খাঁটি দরদ কতটা, কতটা শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি? নাকি ভিতরে ভিতরে এতে আমাদের নিজেদের নৈতিকতা নিয়ে নিজেদের বাহবা দিচ্ছি ও আবেগের প্রকাশের একটা পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এই রকম সন্দেহ জাগে তখনই যখন দেখি খুব যত্ন করে আফ্রিকার ব্যাপারটা জেনে নেবার ধৈর্য আমাদের থাকে না—অত্যাচারিতর দুঃখে অশ্রুমোচন বরঞ্চ অনেক সহজ বলে প্রতিপন্ন হয়। না হলে কবি বেন্‌জামিন মোলোইজের নামটা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে শিখব না কেন? কেন জানব না যে দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু এখন আর ব্রিটিশ শাসিত কলোনী নয়—মহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত এই দেশটি এখন সম্পূর্ণ 'স্বাধীন'। সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা এখন ইয়োরোপিয়ান নন তারাও আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ, বর্ণসংকর বা বাদামীদের মত। সমস্যাটা অন্যরকম—সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতকায়রাই সমস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী—বাকীরা দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের নাগরিক। কাজেই সেখানে আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস (ANC) ও নেলসন মান্ডেলা (ম্যান্‌ডেলা নয়)-র সংগ্রাম—স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্য নয়। অধিকারের জন্য এ লড়াই, ম্যাগী থ্যাচারের বিরুদ্ধে নয়।

হ্যাঁ, স্বাধীনতার জন্য লড়ছে নামিবিয়া বা সাউথ্ ওয়েস্ট এশিয়া। লড়ছে সাউথ আফ্রিকার বোথা সরকারের বিরুদ্ধে। সাউথ ওয়েস্ট অফ্রিকার পিপলস ওগানাইজেশন (SWAPO) এবং তার নেতা নুজোমার সংগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমিকাটা পরিস্কার হওয়া দরকার। নইলে রাজীব গান্ধীই প্রথম নামিবিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে আনন্দে আত্মহারা হবার কোনো মানে হয় না। আফ্রিকা বিভাজনের সময় (১৮৮০—৯০খৃঃ) শৌল্পক হীরা, কোবাল্ট ও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ নামিব মরুভূমি (ঐ নামে একটা উপজাতিও আছে তাই এই আফ্রিকান নাম। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার দেশজ নাম হবে আজানিয়া, রোডেশিয়া যেমন হয়েছে জিম্বাবয়ে) আচ্ছন্ন এই অঞ্চলটি জার্মানরা দখল করে। প্রথম মহাযুদ্ধ পরাজয়ের ফলে আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশগুলির মত (পশ্চিমে তোগা এবং ক্যামেরুন। পূর্বে টাংগানিইকা যা বর্তমান তানজানিয়ার প্রধান ভূখণ্ড) এ অঞ্চলও জার্মানী লীগ্ অফ নেশন্‌সের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। লীগের ম্যান্‌ডেট কাউন্‌সিলের নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ব্রিটিশ কলোনীয়াল সরকারকে এই অঞ্চল শাসনের ভার দেওয়া হয়—সেই থেকে, ১৯৪৮ সালে বুয়রদের বংশধর আফ্রিকানেরা (ডাচ বংশোদ্ভূত, বর্তমান ক্ষমতাসীন গোঁড়া প্রোটেস্টন্ট বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতকায় সম্প্রদায় যাদের white nationalist বলা হয়) লন্ডনের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও, রাষ্ট্রসংঘকে কলা দেখিয়ে দেশটাকে শাসন করে আসছে। নামিবিয়ার সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে।

জার্মান আমলেই (১৮৯০—১৯১৮), এ অঞ্চলে লুথারান মিশনের কল্যাণে খ্রিষ্টধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। ছলচাতুরি করে আফ্রকান উপজাতির দলপতি বা শাসকদের দিয়ে নথীপত্রে সই করিয়ে জার্মানরা তাদের জমি কেড়ে নেয়; অঞ্চলটির নাম দিয়েছিল হোয়েল চেরিটুরি (Walfish Bay)। উপকূলবর্তী তিমিমাছ সংরক্ষণের জন্য। শুধু জমি নয় তাদের গোসম্পদও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে হেরেরো প্রমুখ উপজাতি তানজানিয়ার বিখ্যাত মাজি মাজি বিদ্রোহের (১৯০৬ খৃঃ) মত করে প্রতিবাদ করেছিল, মাজি মাজি বিদ্রোহের মতই তাদের বিদ্রোহকেও নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল। নামেস্ বলে আরেকটি উপজাতির গোধন কেড়ে নেওয়া হল এবং জমি থেকে উৎখাত করে তাদের শুধুমাত্র জার্মানদের জন্য নির্দিষ্ট 'police zone' থেকে দক্ষিণে ঊষর মরু অঞ্চলে ঠেলে দেওয়া হল।

ম্যান্‌ডেট আমলেও, অর্থাৎ ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট উইলসনের সভ্যতার পবিত্র কর্তব্য নীতির দোহাই দিয়ে গোটা আফ্রিকার মত সাউথ ওয়েষ্ট আফ্রিকাকেও ভাওতা দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নেতা স্মাটস্ (Smuts) এর নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার 'পঞ্চম অঞ্চল' করতে দেওয়া হয় নি বটে (দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়নের চারটে টেরিটরি ছিল কেপ কলোনী, নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট), কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার আদর্শে এখানেও ক্রমে ক্রমে 'segregation' থেকে 'apartheid' বা 'separate development, এর নীতির দিকে অগ্রসরতাকে সর্বভাবে সমর্থন করা হল। জার্মান প্রভুদের বদলে এলো দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় প্রভু। Landis ও Davios এর ভাষায় *Southen Africa : The Continuing Crisis*, eds. Carter and Omena)—"The Africans learned that they had exchanged an overseas tyrant for one from the next door".

দক্ষিণ আফ্রিকার নামিবিয়াকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবার অভিসন্ধি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বহুবার রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ করেছে—সম্ভবত নামাবিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে সেটাই

রাষ্ট্রসংঘের একমাত্র দান। সে কাজ ব্যর্থ হবার পর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আপার্টহাইড নীতিকে নামিবিয়াতেও কায়েমী করার সিদ্ধান্ত নেয় নিম্নলিখিত উপায়ে—(১) "Influx control" এর নামে শ্বেতকায় কবলিত নগর অঞ্চলে 'অবাঞ্ছিত' আফ্রিকানদের (নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসমর্থ—অর্থাৎ শ্রমমূল্য যাদের নেই) প্রবেশ রুদ্ধ করা। (২) আফ্রিকান রিজার্ভ তৈরি করে সেখানে একটা স্থায়ী শ্রমসরবরাহ কেন্দ্র তোর রাখা। (৩) আফ্রিকানদের কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ চাকুরী নিতে বাধ্য করা। (৪) Pass Law চালু করা, (৫) SWALA (শ্রমসংস্থা)-র মাধ্যমে ন্যূনতম বেতনে শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করা—আড়কাঠিদের সাহায্যে কুলি ধরে আনার মত।

নামিবিয়াকে সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার অংশ বিশেষ করে তোলার চক্রান্ত জোরদার হয় ষাটের দশকে। ১৯৬৬ সালের সাতাশে অক্টোবর যখন রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল এসেম্বলিতে ২১৪৫ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামিবিয়াকে আইন সমর্থিত স্বীকৃতি দেওয়া হয় স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে, তখন ওডেনডাল প্ল্যান, (Odendaal Plan) এর সাহায্যে তাকে বাতিল করার চেষ্টা করা হয়। এই প্ল্যান অনুযায়ী একটি সংবিধান রচিত হয়েছিল যাতে নামিবিয়াস্থ শ্বেতকায়দের দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্ট সদস্য পাঠাবার ক্ষমতা দেওয়া হল। ১৯৫৪ সালে যেসব আফ্রিকানদের "নেটিভ রিজার্ভে" আবদ্ধ করা হয়েছিল, এবার তাদের সাউথ আফ্রিকান মিনিস্ট্রি অফ নেটিভ অ্যাফেয়ার্স-এর আওতায় আনা হল যার পরেকার নাম হয় বান্টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট (১৯৬৯)। রাষ্ট্রসংঘকে অগ্রাহ্য করে নামিবিয়াকে দক্ষিণ আফ্রিকার কুক্ষিগত করার জন্য এ এক চক্রান্ত বিশেষ। এই চক্রান্তকে আরও দৃঢ় করা হল ১৯৬৮ সালের 'নেটিভ ন্যাশন আক্ট' দিয়ে। ওডেনডাল প্ল্যানের আদর্শানুযায়ী ৯টি উপজাতিক ভিত্তিক হোমল্যান্ড তৈরি করে দক্ষিণ আফ্রিকার মত নামিবিয়াতেও বান্টুস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হল। এই সঙ্গে সমস্ত দেশের জমির শতকরা ৬০ ভাগ আধকৃত হল মাত্র ১ লক্ষ শ্বেতকায় অধিবাসীদের দ্বারা—যারা ছিলেন সমস্ত নামিবিয়ার মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু সরকার তাদের কলোনী নামিবিয়াতেও আপারট্হাইড বা বর্ণ বৈষম্য নীতিকে সরকারীভাবে কায়েমী করল। রাষ্ট্রসংঘ (U. N. O.) এ ব্যাপারে কোনও প্রকার বাধা দিতে পারল না।

ইতিমধ্যে নামিবিয়াতে কৃষ্ণাঙ্গদের জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ১৯৫২-৫৩ সালের বিরাট ধর্মঘটের পর কণ্ঠরোধ করা হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সরকার সপ্তাহের কাজের সময়কে ৬০ থেকে কমিয়ে ৪৬এ নামাতে বাধ্য হন এবং গোটা ষাট দশক ধরে নামিবিয়াতে শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ চলতেই থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় ছাত্র আন্দোলন। ১৯৫৯ সালে স্যাম নুজোমা এবং জ্যাকব কাহাঙ্গুয়া ওভাম্বোল্যান্ড পিপলস্ অরগানাইজেসন (O. P. O.) নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। পাশাপাশি চীফ কোজোন্গুহোজর নেতৃত্বে "সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (S. W. A. N. U.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। S. W. A. N. U. র প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা হিসাবে নুজোমা ১৯৬০ সালে গড়ে তোলেন সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকান পিপলস্ অরগাইনাইজেসন (S. W. A. P. O.) এই SWAPO-কেই ভারত সরকার এবং আরও কয়েকটি দেশ নামিবিয়ার আইন সংগত স্বাধীন সরকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ওভাম্বো অঞ্চলে যে "উপদ্রব গোটা ষাট দশক ধরে চলতে থাকে তার সঙ্গে SWAPO-র আন্দোলনকে একাত্ম করে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, নুজোমার দল প্রকৃতপক্ষে ট্রাইবাল, তারা শুধু ওভাম্বো উপজাতির স্বার্থ রক্ষক। এইভাবে তারা SWAPO-র জাতীয় চরিত্রকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করে। এটি অতি পরিচিত ডিভাইড এ্যান্ড রুল নীতির একটি প্রয়োগ বিশেষ। এই নীতিই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার প্রয়োগ করে এসেছেন SWAPO এবং SWANU-র ভিতরে দ্বন্দ্বটাকে চিরকাল জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করে।

১৯৭১ সালে সমস্ত নামিবিয়া জুড়ে একটি বিশাল সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে কুখ্যাত SWANLA-কে লুপ্ত করতে হয়। শ্রমিকেরা কন্ট্রাক্ট লেবার পদ্ধতি অবসান দাবী করেছিল, কিন্তু দমননীতি চালু করবার জন্য এই সঙ্গে সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার টেরারিজম্ অ্যাক্টকে নামিবিয়াতে চালু করে এবং ওভাম্বো অঞ্চলে এক ধরনের সামারক আইন জাইন জারী করে। দক্ষিণ আফ্রিকার চীফ্ মাটান্জিমার মত নামিবিয়াতেও কিছু কিছু সরকারের বশংবদ আফ্রিকান চীফ্ ছিল এবং আছে। তাদেরই একজন চীফ্ কোমেন্স্ কাপুউওর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্স্কাই (Trankei) এর মত নামিবিয়াতে কাভাংগো হোমল্যান্ড সৃষ্টি করে ১৯৭৩ সালে। অনিচ্ছুক হোভাঙ্গোদের তারা হোমল্যান্ডে যেতে বাধ্য করে। নানা ভয় দেখিয়ে বলা হয় না গেলে 'পাশ' কেড়ে নেওয়া হবে, চাকরী মিলবেনা কোথাও এবং হাসপাতালে প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও SWAPO-র সদস্যরা তথাকথিত হোভাঙ্গল্যান্ড নির্বাচনকে সম্পূর্ণ বয়কট করেন। সারা ৭০ দশকে নামিবিয়াতে জাতীয় আন্দোলন যতই জোরদার হতে থাকে পুলিশী অত্যাচারও ততই বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালে একজন ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক রিপোর্ট করেন "পুলিশী চাবুক অবারিত নামিবিয়ার জনসাধারণের পিঠে পড়ছে···সর্বত্রই নামিবিয়ার শিশু এবং যুবকেরা SWAPO-র স্লোগান উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত করছে—'ওয়ান নামিবিয়া ওয়ান নেশন'।

এখানেই বলে নেওয়া যায়—নামিবিয়া নামটি আসছে 'নামিব' মরুভূমি থেকে, 'নামা' উপজাতির ভাষায় যার অর্থ হল আশ্রয়। ১৯৭৫ সালে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে সমঝোতার সাহায্যে একটি নামিবিয়ান্ ন্যাশনাল কন্ভেনসন্ সৃষ্টির চেষ্টা হয়। কিন্তু প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে উগ্রপন্থী SWAPO নরমপন্থী SWANU এবং নামিবিয়ান্ ন্যাশন্যাল কাউন্সিল নামক একটি নগণ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনরকম স্থায়ী জোট বাঁধা সম্ভব নয়। চীফ্ কাপুপু'ও'র এই সংস্থার সভাপতি হবার কথা ছিল। জোট ভেঙে যাবার পর অর্গানিজেশন্ অফ্ আফ্রিকান ইউনিটি (ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস্ আবাবাতে যার কেন্দ্র) এবং ইউ. এন্ ও-র পক্ষ থেকে একমাত্র SWAPO-কেই নামিবিয়ার জনসাধারণের প্রতিভূ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। SWAPO'র গেরিলা বাহিনী 'পিপল্স্ লিবারেশন আর্মি অফ নামিবিয়া (PLAN) সেই থেকেই আদ্দিস আবাবার 'লিবারেশন কমিটি' এবং সমাজতন্ত্রী দেশগুলি থেকে সামরিক সাহায্য পেতে শুরু করে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি থেকে বেসামরিক সাহায্য এবং তৃতীয় দুনিয়া থেকে নৈতিক সমর্থক পেতে থাকে। পশ্চিমী দেশগুলি থেকে সামরিক সাহায্য চেয়েও নুজোমা পান নি, কেননা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কোনভাবেই সশস্ত্র আন্দোলনকে সমর্থন করা অ্যাংলো-আমেরিকান গ্রুপের পক্ষে সম্ভব নয়, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে সে সব দেশের অনেক টাকা খাটে। জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকাতে নামিবিয়া ইনস্টিটিউট নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয় যার মাধ্যমে 'ফ্রন্ট লাইন' রাষ্ট্রগুলি (দক্ষিণ আফ্রিকা ও তস্মিত্র মালাউয়ির প্রান্তবর্তী দেশগুলি অর্থাৎ বোৎসোয়ানা, মোজাম্বিক, জাম্বিয়া তানজানিয়া, ১৯৭৮ সালের পর জিম্বাবোয়ে, অ্যাঙ্গোলা) নামিবিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করতে ব্রতী হয়। প্রত্যুত্তরে জাম্বিয়া সীমান্তের কাছে কাপ্রিভি স্ট্রিপ (Caprivi strip) অঞ্চলে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার 'টেররিজম অ্যাক্ট' প্রয়োগের নাম করে অকথ্য অত্যাচার শুরু করে. জাম্বিয়া সীমান্ত অতিক্রম করে সে দেশের পশ্চিম প্রদেশে হামলা করতে থাকে।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি অ্যাঙ্গোলা থেকে পর্তুগীজদের অন্তর্ধান নামিবিয়ার পক্ষে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। অ্যাঙ্গোলা থেকে 'উৎপাত' ঠেকাবার নাম করে নামিবিয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক তৎপরতা তিনগুণ বৃদ্ধি পেল। এদিকে ঠিক উত্তরেই একটি স্বাধীনদেশের বন্ধুত্ব অর্জন নামিবিয়ার মুক্তি সংগ্রামীদের মনোবল বৃদ্ধি করলেও, দক্ষিণ আফ্রিকা সমর্থিত UNITA দল অ্যাঙ্গোলার দক্ষিণাঞ্চলেই সক্রিয় হওয়াতে নামিবিয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক উপস্থিতি আরো জরুরী হয়ে পড়ল। অ্যাঙ্গোলা থেকে দক্ষিণে সোভিয়েৎ রাশিয়া ও কিউবার সম্ভাব্য প্রাগ্রসরতা রুদ্ধ করবার জন্য এটাই হল দক্ষিণ আফ্রিকার চাল। নামিবিয়া হয়ে উঠল তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার একটি সম্ভাব্য কেন্দ্র। এদিকে নামিবিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ফোর্স্টার সরকার (Vorster) কিঞ্চিৎ নমনীয়তার ভান করলেন। কোনো কোনো সরকারী অফিসে বর্ণবৈষম্য নীতি তুলে নেবার এবং পাশ আইন তুলে নেবার কথা 'চিন্তা করা হল'। প্রকৃতপক্ষে সুইমিং পুলে, কফি হাউসে, খৃষ্টীয় উৎসবে বিভেদ নীতি চালুই রইল।

কিসিঞ্জারের পর থেকে আফ্রিকা বিষয়ে আমেরিকান নীতির যে পরিবর্তন হয় তার ঢেউ নামিবিয়াকেও স্পর্শ করে। প্রকৃতপক্ষে নামিবিয়াকে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়তে পারে না প্রধানত তার গোসম্পদের জন্য এবং আমেরিকার অদৃশ্য হাত সেখানে থাকা দরকার খনিজ সম্পদ সংগ্রহের জন্য। তাই এক হাতে আমেরিকা বোথা (Botha) সরকারকে চাপ দিচ্ছেন নামিবিয়াকে 'স্বাধীন' করে দেবার জন্য, অন্য হাতে সেখানে জাইরে বা পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়ার মত একটি বশংবদ 'স্বাধীন' রাষ্ট্র গঠনের তাল করেছেন—নয়া-ঔপনিবেশিক বা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সূত্র ধবে। কোন কাজ হয়নি আজ পর্যন্ত। ১৯৭৮ সালের টার্ন হল সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নামিবিয়াকে স্বাধীনতা দেবার এবং তাকে একটি ইউনিটারি স্টেটে পরিণত করবার। বলা বাহুল্য সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। ঐ বছরই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের তাবেদার চীভ্ কাপুউও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে নিহত হলেন। অ্যাঙ্গোলার রাজধানী লুয়াণ্ডা শহরে ফ্রন্ট লাইন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন নুজোমাকে সর্বরকম সাহায্যের।

নুজোমাকে যুদ্ধ করতে হবে একাধিক শত্রুর বিরুদ্ধে ১. উপজাতিগত অন্তর্বিরোধ (ওভাম্বো, হেরেরো, নামা, ৎসোয়ানা, নাজু, খোইখোই সাদর্ন লুন্ডা ইত্যাদি উপজাতির মধ্যে; সান ও খোইখোইকে কলোনীয়াল আমলে বলা হত বুশ্‌মেন ও হটেনটট্—এখন ঐ নাম দুটি আফ্রিকানদের মধ্যে অশ্রদ্ধেয়)। ২. দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ ৩. দারিদ্র, আফ্রিকা, সমগ্র বিশ্বের বিবেকবান মানুষের দিকে তাই তাকিয়ে আছেন এই মরুব্যাপ্ত রুক্ষ ভূখণ্ডের অনগ্রসর জনসাধারণের নেতা।

কয়েকটি সহায়ক গ্রন্থ :

১. এরিখ এ. ওয়াকার / *A History of Southern Africa* (পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত)।

২. রুথ ফার্স্ট / *South West Africa.*

৩. জ্যোতি ভট্টাচার্য্য / উত্তাল আফ্রিকা-দক্ষিণ।

ক্রীতদাসত্বের উত্তরাধিকার ও আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নারী : এঞ্জেলা ডেভিস

মালিনী ভট্টাচার্য

আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী এঞ্জেলা ডেভিস। দীর্ঘদিন কারান্তরালে আটক রাখার পর দেশে ও বিদেশে জনমতের চাপে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে তিনি ক্যালিফর্নিয়াতে অধ্যাপনা করেন। তাঁর *Women, Race and Class* বইটি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে তিনি যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণাঙ্গ নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করেছেন তাই নয়, আমেরিকার নারী আন্দোলন কিভাবে বারবার বর্ণ ও শ্রেণীর প্রশ্নে হোঁচট খেয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, তার একটি নিরপেক্ষ এবং যুক্তিপূর্ণ পর্যালোচনাও করেছেন। যাঁদের বৃহদংশই শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সেই কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের এই নারীমুক্তি আন্দোলন কেন সেভাবে টানতে পারে নি তার একটি স্পষ্ট ছবি এই পর্যালোচনা থেকে ফুটে ওঠে। যাঁরা নারীমুক্তির আন্দোলন করেন তাঁরা যদি বর্ণ ও শ্রেণীগত বৈষম্যের বিচারকে মূলতুবি রেখে দেন তাহলে নিছক নারীমুক্তির দাবিগুলির ভিত্তিতে বৃহত্তর নারী সমাজকে আন্দোলনে সামিল করতেও তাঁরা সক্ষম হন না, এঞ্জেলা ডেভিসের যুক্তির সারমর্ম এটাই। বর্তমান রচনায় শ্রীমতী ডেভিসের বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের (*The Legacy of Slavery : Standards for a New Womanhood*) সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীতদাসসমাজের ইতিহাস যাঁরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন, ক্রীতদাসীদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে এ-পর্যন্ত তাঁদের কেউই বিশদ আলোচনা করেন নি। তার ফলে শুধু ক্রীতদাসীদের অর্থনৈতিক ভূমিকা নিয়েই নয়, দাসসমাজের পারিবারিক জীবন নিয়েও অনেক ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। শ্রীমতী ডেভিস দেখিয়েছেন, প্রথম থেকেই দাস ব্যবসায়ী ও মালিকদের কাছে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সংজ্ঞা ছিল আগে শ্রমিক, পরে নারী। ক্রীতদাস মানেই অস্থাবর সম্পত্তি, মূর্ত শ্রমশক্তি হিসাবেই তার মূল্য, তা সে মেয়ে-পুরুষ যাই হোক না কেন। সাহিত্যে আংকল্ টম বা সাম্বোর পাশাপাশি আন্ট্ জেমিমা বা ব্ল্যাক ম্যামিকে দেখানো হয়েছে প্রধানত বাড়ির ঝি বা শিশুদের ধাত্রী হিসাবে, প্রথাগত 'নারীসুলভ' ভূমিকায় নিযুক্ত। বাস্তব অবস্থা ছিল এর ঠিক বিপরীত। বিশেষত ক্রীতদাসত্বের মূল আস্তানা দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে আটজনের মধ্যে সাতজন ক্রীতদাসকেই ক্ষেতের কাজে লাগানো

হত নারীপুরুষ নির্বিশেষে। মেয়েরা পরিশ্রম করত পুরুষদের সমান সমান, মালিকের কাছে মেয়ে হিসাবে তাদের আলাদা অস্তিত্বের কোনো স্বীকৃতিই ছিল না। ছোটো বাচ্চা পিঠে বেঁধেও তাদের পুরুষের সমানই কাজ করতে হত, যারা দুগ্ধ-পোষ্য বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে আসত পূর্ণস্তনের যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে কাজে পেছিয়ে পড়লে তারা অকথ্য শাস্তি পেত। শাস্তির ব্যাপারেও কালো পুরুষদের সঙ্গে তাদের ছিল সমান অধিকার, সামান্য ত্রুটির জন্য বেত্রাঘাত থেকে এমন কি গর্ভবতী মেয়েদেরও রেহাই ছিল না। নারীসুলভ কমনীয়তার বিচার করে কৃষ্ণাঙ্গীদের কখনোই কয়লাখনির কাজ, লোহা ঢালাইয়ের কাজ, কাঠচেরাই বা খাদ কাটার কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নি। মার্কস-এর 'ক্যাপিট্যাল' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ডেভিস দেখিয়েছেন শিল্পবিপ্লবের প্রথম স্তরে ইংল্যান্ডেও মেয়ে শ্রমিকরা (তারা কিন্তু শ্বেতাঙ্গই ছিল) 'মেয়ে' বলে কখনো ভারী কাজ থেকে মুক্তি পায় নি। যুক্তরাষ্ট্রে দাক্ষণী খনিগুলিতে কালো মেয়েদের দিয়ে যেমন মালগাড়ি টানানো হত, ইংল্যান্ডেও মেয়ে শ্রমিকরা ব্যবহৃত হত খাল দিয়ে নৌকা টেনে নেবার কাজে ভারবাহী পশুর বিকল্পরূপে।

ডেভিসের বক্তব্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া জগতে 'নারীত্বে'র যে পেলব, কোমল, গৃহকেন্দ্রিক ভাবমূর্তি তৈরী হয়—বুর্জোয়া মেয়েরাই পরে যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসীরা শ্বেতাঙ্গ নারীশ্রমিকদের মতই তার আওতায় কখনো আসে নি। তাদের ক্ষেত্রে শ্রমের ডপারমূল্য শোষণের তথা শ্রেণীশোষণের ব্যাপারটা ছিল প্রাথমিক। স্বশ্রেণীর পুরুষদের সঙ্গে তারা ভোগ করত, যাকে ডেভিস বলেছেন—এক ধরনের 'equality in oppression' অর্থাৎ অত্যাচারের সমতা। অবশ্য শ্রেণীশোষণকে আরো জোরদার করার জন্য, তাদের মাথা হেঁট করে দেবার জন্য দাসশ্রেণীর নারীদের ওপর কতকগুলো বিশেষ ধরনের অত্যাচারও চলত। যখন আইন করে দাস-ব্যবসা বন্ধ করা হল নতুন দাস আমদানী বে-আইনি হয়ে গেল, তখন দাসপ্রথাকে জিইয়ে রাখার জন্য দাসদের মধ্য থেকেই নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি প্রয়োজন হয়ে পড়ল। দাসমেয়েদের আগে প্রাথমিক আস্তত্ব ছিল শ্রমিক হিসাবে, এখন কিন্তু অর্থনৈতিক চাপের জন্যই তাদের প্রজননক্ষমতা একটা বিশেষ স্বীকৃতি পেল। সন্তানধারণের ক্ষমতা একজন ক্রীতদাসীর মূল্যকে বাড়িয়ে দিত। অবশ্যই তাকে দেখা হত মানুষ মা হিসাবে নয় প্রজননক্ষম পশু হিসাবে, কারণ ক্রীতদাসী মায়ের বুক থেকে সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি করার ব্যাপারে মালিকশ্রেণী কখনোই একটুও দ্বিধা করে নি। মা-হিসাবে তার অস্তিত্বকেও নিয়ন্ত্রণ করত তার শ্বেতাঙ্গ প্রভুর অর্থনৈতিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজন।

এছাড়াও কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসীর নারীত্ব আরও একভাবে প্রভুদের কাছে স্বীকৃতি পেত, দাসপ্রথার গোড়া থেকে ক্রীতদাসী ধর্ষণের অজস্র ঘটনা যার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এই 'স্বীকৃতি'র গোড়ার কথা শ্বেতাঙ্গ পুরুষের যৌনলিপ্সা নয়, ক্রীতদাস ও দাসীদের আত্মসম্মানবোধ গুঁড়িয়ে দেবার, তাদের ওপর নিজের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার এটা একটা অমানুষিক উপায় মাত্র। দীর্ঘদিন শ্বেতাঙ্গ সাহিত্যে এমন ধারণা চালু আছে যে শ্বেতাঙ্গ নারীর স্বাভাবিক সতীত্বের ধর্মে প্রতিহত শ্বেতপুরুষ যৌন অতৃপ্তি মেটানোর জন্যই যার স্বভাবত কামপরায়ণা কৃষ্ণাঙ্গীর কাছে। ডেভিস দেখিয়েছেন, এখানে পুরুষশাসিত সমাজের মতাদর্শ এবং বর্ণবিদ্বেষ-শাসিত সমাজের মতাদর্শ কি সুন্দর খাপে খাপে মিলে গেছে। বস্তুত কৃষ্ণা ক্রীতদাসীর ওপর যৌন অত্যাচার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অত্যাচারেরই একটি বিশিষ্ট রকমফের, পূর্বোক্ত ঘটনা এই অত্যাচারকে একটা ওপর-পালিশ দেবার জন্যই তৈরি, আর তার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে পুরুষশাসিত সমাজে শ্বেতাঙ্গ নারীর নকল ভাবমূর্তিটি। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে যারা নারীমুক্তিযোদ্ধা তাঁদের শায়েস্তা করার জন্যও ধর্ষণকে রণনীতির অংশ হিসাবে ব্যবহার করেছিল মার্কিন যুদ্ধবাজরা। ডেভিসের মতে কৃষ্ণা ক্রীতদাসীরা যখন এইভাবে ব্যবহৃত হত, তখনও তার মূল কারণ নিহিত ছিল শ্বেতাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে তার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে। ঠিক একইভাবে পরবর্তীকালে lynching নামক কৃষ্ণাঙ্গ হননের বর্বর প্রথা আসলে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারের লড়াইকে দাবিয়ে রাখার জন্য উদ্ভাবিত হলেও তাকে নীতিগতভাবে জোরদার করার জন্য তৈরি হয়েছিল কামান্ধ কৃষ্ণাঙ্গ ধর্ষণকারীর 'মিথ'। পরের একটি পরিচ্ছেদে ডেভিস দেখিয়েছেন নারীমুক্তি আন্দোলনের সাম্প্রতিক কালের অনেক ধ্বজাধারীও বর্ণবিদ্বেষমূলক এই অপপ্রচারকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ তথা মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমিকে অবহেলা করে পুরুষ-নারীর দ্বন্দ্বকে মূল দ্বন্দ্ব বলে ধরে নেবার ফলে তাঁদের যৌন অত্যাচার-বিরোধী আন্দোলন কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের তেমনভাবে টানতে পারে নি।

দাসপ্রথার যুগে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা মূলত শ্রমিক ছিল বলে প্রথম থেকেই বেঁচে থাকার স্বার্থেই তাদের আয়ত্ত করতে হয়েছিল অনেক তথাকথিত 'পুরুষালি' গুণ। বলিষ্ঠ পেশী ও চলাফেরার মুক্ত ভঙ্গিতে তারা শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, আমেরিকায় শিল্প বিপ্লব অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মেয়েরাও ক্রমশ উৎপাদনমূলক শ্রমের ক্ষেত্র থেকে সরে আসছিল, তারা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল পরনির্ভর অন্তঃপুরিকার ভূমিকায়। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা এই 'অধিকার' কখনো পায় নি। তাই দাসপরিবারের মধ্যে নারীপুরুষের সম্পর্ক মালিকশ্রেণীর মধ্যে ঐ সম্পর্কের মত একেবারেই ছিল না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সাম্য ছিল দাসপরিবারের বৈশিষ্ট্য। মেয়েদের মালিকের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত বলেই ঘরের কাজে পুরুষদেরও অংশ নিতে হত। গৃহশ্রমের এলাকায় নারীর কাজ ও পুরুষের কাজের মধ্যে কোনো জল-অচল ভাগা-

ভাগ্যও ছিল না।

১৯৬৫ সালে মার্কিন পণ্ডিত ময়নিহানের নেতৃত্বে সরকারি উদ্যোগে আমেরিকার নিগ্রো পরিবারের ওপর একটি সমীক্ষা করা হয়। ময়নিহান বলেছেন, কালোদের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির পিছনে আছে দাসপ্রথার আমল থেকে প্রচলিত তাদের পারিবারিক গঠন—ময়নিহানের মতে যা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। দাসপুরুষের আধিপত্য তার পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়াটাই তাঁর মতে সব গণ্ডগোলের গোড়া। কালো মেয়েরা পরিবারের মধ্যে ছিল বড় বেশি প্রবল, বড় বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ। তার ফলে কালো সন্তানেরা নানাধরনের মানসিক গণ্ডগোল নিয়ে বেড়ে ওঠে। এই 'কুখ্যাত' ময়নিহান্-রিপোর্টের প্রতিবাদ করে ডেভিস দেখিয়েছেন এই তত্ত্বের ভিত্তি তথ্যবিকৃতির ওপর।

প্রথমত, ক্রীতদাসত্ব কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের পারিবারিক সত্তাকে ধ্বংস করতে পেরেছিল, এ ধারণাটাই তর্কসাপেক্ষ। শ্বেতাঙ্গ মালিকের নিষ্ঠুর শোষণের একটা দিক অবশ্যই ছিল স্বামী থেকে স্ত্রীকে, মা থেকে সন্তানকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কিন্তু পারিবারিক জীবনের এই ভঙ্গুরতা পারিবারিক মূল্যবোধগুলিকে আরো জোরদার করতে সাহায্য করেছিল, কারণ তাদের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি তাদের পারিবারিক জীবনের বাইরে আর কোথাও ছিল না। তাদের গার্হস্থ্য নীতিবোধ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের চাইতে আলাদা ছিল, কিন্তু এই নীতিবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। চূড়ান্ত অমানবিক ব্যবস্থার মধ্যেও বহুকষ্টে গৃহের মধ্যে তারা মানবিক মূল্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, মালিকের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দাসপরিবারগুলিতে সন্তানদের পরিচিতি হত মায়ের নামেই। বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চলে এই ছিল আইন। কিন্তু মালিকরা দাসসন্তানের পিতৃপরিচয়কে অস্বীকার করলেই এটা প্রমাণ হয়না যে দাসপরিবারের মধ্যে—যেখানে পিতাকে বলপূর্বক অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়া হয় নি—সেখানে পিতার ভূমিকা মাতার তুলনায় গৌণ ছিল, বা পরিবারের মধ্যে তার কোনো সম্মান ছিল না। এইটুকুই বলা যায়, শ্বেতাঙ্গ পরিবারের সঙ্গে প্রতিতুলনায় দাসপরিবারের মা বা স্ত্রী এক ধরনের সাম্য ও স্বাধীনতা ভোগ করত। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই শুধু তাদের 'মানবিক' হবার সুযোগ ছিল বলে গৃহকর্ম কখনো তাদের কাছে নিকৃষ্টতার চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায় নি; অন্যদিকে ঊনিশশতকী শ্বেতাঙ্গ পরিবারে নারী মানেই 'গৃহবধূ' আর 'গৃহবধূ' মানেই অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের প্রাণী। তাছাড়া দাসপরিবারের নারীপুরুষের সাম্যের ভিত্তি ছিল নারীর মৌল 'শ্রমিক'-পরিচিতি। পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ নারীর মেয়ে-মাকড়সালভ ভূমিকার কাহিনীটা নেহাৎই কাহিনী—যাকে কৃষ্ণাঙ্গসমাজের সমস্যাগুলির মূল কারণকে চাপা দিয়ে রাখার জন্য সহজেই ব্যবহার করা যায়। কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষকে প্রথাগত অর্থে তার 'পৌরুষ' জাহির করতে দেওয়াটা শ্বেতাঙ্গ মালিক বিপজ্জনক বলেই ভাবত; কিন্তু তার ফল হয়েছিল এই যে পুরুষশাসিত শ্বেতাঙ্গসমাজের মূল্যবোধকে ক্রীতদাসরা তাদের পারিবারিক জীবনে কখনো মেনে নেয় নি।

শ্রমের জগতে ও গার্হস্থ্যজীবনে এই যে যন্ত্রণাদায়ক সাম্যের বোঝা কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের বইতে হত তার ফলশ্রুতি হিসাবে দাসপ্রথা উচ্ছেদের লড়াইয়ে তারা প্রথম সারির সৈনিক হিসাবে দেখা দিয়েছিল। শত অত্যাচারের মধ্যে তাদের শ্রেণীঘৃণা আরো প্রবল হয়ে দেখা দেয়। দাস হিসাবে নিজের অস্তিত্বকে নত শিরে মেনে নেওয়াটা নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। হ্যারিয়েট ট্যাবম্যানের মত অনেক বীর কৃষ্ণাঙ্গ নারীই মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের উত্তরের রাজ্যগুলিতে পলায়ন সংগঠিত করতেন। দাস অভ্যুত্থানগুলিতে অগ্রণী ভূমিকাও নিতেন মেয়েরা। ডেভিস এক ক্রীতদাসীর উদাহরণ দিয়েছেন যিনি পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে নিজের কন্যাকে হত্যা করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "আমার মেয়েকে জানতে হবে না দাসত্ব কী জিনিষ। আর আমি? দাসত্বে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আমি বরং গান গাইতে গাইতে ফাঁসিকাঠে গিয়ে উঠব"। ডেভিসের ভাষায় এটাই 'দাসত্বপ্রথার চূড়ান্ত আয়রনি' যে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের ওপর যে সীমাহীন নির্লজ্জ শোষণের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল—নারী বলে তাদের যে কোন রেয়াৎ করা হয় নি—তার ফলে এই মেয়েরা শুধু সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই নিজেদের সমতা প্রতিষ্ঠিত করে নি, প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও তারা সমান দায়িত্ব নিতে পেরেছিল। শ্বেতাঙ্গ নারীরাও দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন, কিন্তু কাঠোর শ্রম, পারিবারিক সমতা, প্রতিরোধ, মালিকের প্রহার ও ধর্ষণ কৃষ্ণাঙ্গ নারীর ব্যক্তিত্বে যে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছিল তা অনেক সময়েই থাকত তাঁদের বোধের বাইরে।

প্রাচীন বাংলার দুটি চিঠি

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি চিঠির উল্লেখ করা হয়। চিঠিটি আহোমরাজ চু-কাম্-ফাকে কামতা-রাজ নরনারায়ণ লিখেছিলেন। এটা উল্লেখ করার প্রধান কারণ হল এর প্রাচীনত্ব। ১৪৭৭ শকাব্দের আষাঢ় মাসে এটি লেখা [অর্থাৎ ইংরেজী ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাস]। এত পুরানো চিঠি আমরা আগে পাইনি। বাংলা গদ্যের ইতিহাসের গোড়া-পত্তন কীভাবে হয়েছিল তা খুঁজতে গিয়ে এই চিঠির উল্লেখ করার কারণ—চিঠি মানুষ গদ্যেই লেখে, যেমন মানুষ গদ্যেই কথা বলে পদ্য মিলিয়ে বলে না। কাজেই প্রাচীন কালে কী ধরনের গদ্যে বাঙালীরা লিখত তা দেখাতে গিয়ে সবচেয়ে পুরানো উল্লেখ হিসাবে চিঠিটিকে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ যে ব্যবহার করবেন এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে চিঠিটির অল্প একটু অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হয়। গদ্যের নমুনা দেখাতে গোটা চিঠিটি দেখানোর দরকার কি? কিন্তু গোটা চিঠি এবং তার উত্তরে পাওয়া দ্বিতীয় চিঠি এই দুটি নিদর্শন দেখলেই এমন অনেক নতুন পরিপ্রেক্ষিত ধরা পড়বে যেগুলি আগে কখনো দেখা হয়নি। এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উপভাষাতত্ত্বের নানান দিক ছাড়াও সমাজ রাজনীতি এবং সংস্কৃতির বিচিত্র চেহারা ধরা পড়ে। এ প্রবন্ধে সেই দিকগুলিই আমরা দেখাব।

কোচবিহার-কামতা-কামরূপ

পূর্ব ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকালে একটা জিনিস নজরে আসবে তা হল গঙ্গার উত্তর পাড়ের একটা টানা সমতলভূমি। সেটা বিহারের দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া কাটিহার হয়ে সমগ্র বাংলা-দেশের দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার পেরিয়ে এখনকার আসামের গোয়ালপাড়া কামরূপ পর্যন্ত চলে গেছে। গঙ্গা ইতোমধ্যে কাটিহারের অনেক দক্ষিণ থেকেই দক্ষিণবাহিনী হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে গেছে। আবার পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে আসা ব্রহ্মপুত্র নদটি গোয়ালপাড়া থেকে প্রায় সমকোণে দক্ষিণবাহিনী হয়ে যমুনা নাম নিয়ে বয়ে চলেছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ দুই অববাহিকাতেই সমতল ভূমি থাকলেও উত্তর দিকের সমতল অঞ্চলের প্রস্থটা একটু বেশি। এর ফলে কোচবিহারের গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ অন্যদিকে জলপাইগুড়ি রংপুর দিনাজপুর এগুলির মধ্যে যাতায়াত, রাজ্য ভাঙাগড়া, সীমান্তের রদবদল যথেষ্ট বেশি পরিমাণেই হয়ে চলেছিল। কখনো কোচবিহারের রাজারা এগিয়ে গিয়ে কামরূপ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছেন কখনও অহোম রাজারা কামরূপ মুক্ত করে কোচবিহার পর্যন্ত চলে আসতেন। আবার উত্তর থেকে ভোটরাজা দক্ষিণে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত আসতেন আবার কোচরাজের সৈন্যদেব তাড়ায় আপন অঞ্চলে চলে যেতেন। পাশাপাশি রাজ্য থাকলে যা হয়।

এখন যা কোচবিহার বলে পরিচিত তার প্রাচীন নাম বেহার। কোচ রাজবংশের অধীনে এসে এবং সম্ভবত পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে পৃথক্ সত্তা বোঝানোর জন্য কোচবেহার বা কোচবিহার শব্দটি চালু হয়ে গেছে। অন্যদিকে প্রাচীনকালে এটাই কামতারাজ্য বলে পরিচিতি লাভ করেছিল। এখনকার কোচবিহার শহরের প্রায় মাইল চৌদ্দ দক্ষিণে সিংমারী নদীর পারে কামতাপুর বলে জায়গা আছে। এখানকার দেবী কামতেশ্বরী। [ইনি গোসাঁঞানী বা গোসানী বলে জায়াগাটির নাম গোসানীমারী হয়েছে এখন]। এই কামতাপুর বা কামতা-রাজ্য থেকে কোচরাজবংশের আগেকার খেন বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন।

বেহার-কামতা-কামরূপ এর মধ্যে একটা ভৌগোলিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান তৈরির এটাই বাস্তব পটভূমিকা। মনে রাখতে হবে একটু দক্ষিণে গৌড় রাজ্য কিন্তু

PRESIDENCY COLLEGE
LIBRARY, CALCUTTA

সে আমলে এই আদান প্রদানের বাইরেই রয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

কোচ রাজবংশের এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন রাজা বিশ্বসিংহের পুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণ। আনুমানিক ১৫৪০ (মতান্তরে ১৫৫৫) খ্রীষ্টাব্দে ইনি কামতার সিংহাসনে বসেন। কামতা, যা পশ্চিমে করতোয়া নদী ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের গৌহাটি পর্যন্ত এবং উত্তরে ভোট রাজ্য আর দক্ষিণে গারোপাহাড় (এখনকার মেঘালয় রাজ্য) পর্যন্ত বিস্তার ছিল তা বিশ্বসিংহের সময়েই কোচবেহার নামে পরিচিত হল কামতাপুর থেকে কোচবেহারে রাজধানী স্থাপন করার জন্য। পাশের অহোম রাজদের সঙ্গে এবার অসদ্ভাব বাড়তে লাগল—শুরু হল বিবাদ-বিসংবাদ।

গৌড়ে সে সময় হুমায়ুন, শেরশাহ এবং শেরশাহের অধীনস্থ শাসন কর্তারা রাজত্ব করছেন। পরে তাঁদের তাড়িয়ে শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ এঁরা সিংহাসন দখল করছেন, রাজত্ব করছেন—বাঙালী প্রজাসাধারণের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই কোনও শাসকের।

বিবাদ বিবরণ

অসদ্ভাব থাকলে বিবাদ গড়ে উঠতে দেরি লাগে না। নরনারায়ণের ভাই কুমার দীপসিংহ, হেমধর এবং কুমার রামচন্দ্র এঁরা রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন কাজে কামতা রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে নিযুক্ত ছিলেন। একবার একটা তীর্থস্নান উপলক্ষে আগত তাঁদের সেন্যরা এক আহোম রাজকর্মচারীর একটা নৌকা আটক করতেই বিবাদ বেধে গেল। আহোম সৈন্যরা দীপসিংহের সৈন্যদের আক্রমণ করল, প্রায় একশ লোককে বধ করল, দীপসিংহ নিহত হলেন, হেমধর ও রামচন্দ্রেরও প্রাণান্ত হল। দীপসিংহের কন্যা এবং চোদ্দটি হাতি আহোম রাজপুত্রের হাতে বন্দী হল। এরপর কামতা রাজের সেন্যরা একবার আহোমরাজ সৈন্যদের তাড়িয়ে 'সাওল' পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করল—আবার প্রাণ্ত আক্রমণে ফিরেও আসতে হল। একবার তারা পিকিলা দুর্গ অধিকার করল। সেবারই আবার তাদের পরাজিত এবং নিহত হতে হল। এর মধ্যে কামতা রাজ্যের জনেক সামন্ত রাজা আহোম রাজ শুক্-লে-মুং এর আশ্রয় নিল এবং আহোমরাজ তার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লেন। এসব খণ্ড যুদ্ধ ইত্যাদির অবসান হয়েছিল যখন নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় দারুন বীরত্ব প্রদর্শন করে আহোমরাজা দখল করেন। শুধু তাই নয়, পরে কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট এসব জায়গাতেও অভিযান চালিয়ে এসব রাজ্যকে করদ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। গৌড়ের অধিকার নিয়ে পাঠান-মোঘল বিবাদ চলছিল বলে কোচ রাজারা বাধা পান নি। সে বাধা সুলেমান কররাণীর [১৫৬৫-৭২] সময় প্রথমে আসে। পরে মোগল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ১৫৭৫ নরনারায়ণ এবং মোগল শাসকগণ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন (১৫৭৮)।

চিঠি ও দৌত্য

বিবাদ যখন চলছে তখনই, ১৪৭৭ শকাব্দের (১৫৫৫ খ্রী) আষাঢ় মাসে নরনারায়ণ নিজে উদ্যোগী হয়ে কয়েকজন দূতের হাত দিয়ে কিছু উপহার সমেত চিঠিটি পাঠালেন—যার আপাত উদ্দেশ্য শান্তিস্থাপন। দূতদের নাম হল শতানন্দ কর্ম্মী, রামেশ্বর শর্ম্মা, কালকেতু সরদার, ধুমা সরদার, উদ্ভাণ্ড চাউনিয়া এবং শ্যামরায় চাউনিয়া।

দূতেরা রাজার কাছে শুধু চিঠি নিয়ে যায় কি করে? সুতরাং উপহার হিসাবে দুটি ঘোটকী, দুটি গাভী, একটি চ্যাং মাছ (!) এক জোড়া বালিশ, ছিপ ৯টি, শাড়ী ৫টি, 'সন্দেশ গোমচেং ১, ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০' এই সব জিনিসও পাঠানো হয়েছিল।

কেঁচোর রস

প্রচলিত গল্প হল চিঠিটি নাকি কেঁচোর রসে লেখা হয়েছিল। লোক সমাজে অদ্ভুত কথার প্রচলন কেন কখন হয়ে থাকে তা কে বলবে? বলা হল যে কেঁচোর রসে লেখার জন্য কেউই নাকি প্রথমে সে চিঠি পড়তে পারে নি। শেষে তা পড়ে দিল দুর্গাচরণ কাকাত নামে এক কর্মচারী। কেঁচোর রসে লেখা বলে দিনের আলোয় নয়, রাতের অন্ধকারের মধ্যে তা পড়ে ফেলল দুর্গাচরণ। আহোমরাজ খুশি হয়ে দুর্গাচরণকে পুরস্কার তো দিলেনই তাছাড়া এ কথাও বললেন যে দুর্গাচরণ কাকতির বংশে যে কেউই যে কোন অপরাধ করুক না কেন তাদের কখনই প্রাণদণ্ড হবে না।

কেঁচোর রসে লেখা সম্ভব কি না, আর সে লেখা রাতের অন্ধকারে জ্বল্-জ্বল্ করে কি না তা অবশ্য আমরা পরীক্ষা করে দেখিনি।

চিঠির বয়ান

সম্পূর্ণ চিঠিটি এবার উদ্ধার করে দিই :

"স্বস্তি সকলদিগদন্তিকর্ণতালাস্ফালসমীরণপ্রচলিতহিমকর-হাসকাশকৈলাসপাণ্ডরযশোরাশিবিরাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙ্গিণীসলিলনির্মলপবিত্রকলেবরবীষণধৈর্য্যমর্য্যাদাপারাবারদিক্কামিনীগীয়মানগুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমর আমার কর্তব্যে সে বান্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমারো এ গোট কর্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু

ও ধুমা সন্দার উন্ডন্ড চাউনিয়া স্যামরাই ইমরাত পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ (৯) সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গইছে। আরু সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।

অক্ষরাম্বড়

চিঠিটির প্রথম লক্ষণীয় বিষয় স্বস্তি শব্দর পর থেকে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদে রাজাকে ভূষিত করার ব্যাপারটি। সংস্কৃত ভাষায় এই অক্ষরাম্বড়কে গৌড়ী রীতির বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমগ্র পূর্বভারতেই এ রকম আড়ম্বর পূর্ণ ভাষার ব্যবহার ছিল। কামতা কামরূপ কোচবেহারের অবস্থান গৌড় দেশের উত্তরে ; আবার এ চিঠির উত্তরে আহোম-রাজ যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন যার উল্লেখ মাত্র সাহিত্যের ইতিহাসে নেই তাতেও একই ধরনের অক্ষরাম্বড়।

মূল পত্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

এরপরের পংক্তিতে 'লেখনং কার্য্যঞ্চ' বয়ানটির মানে হল এই-খান থেকে মূল লেখা বা কাজের কথা সুরু হল। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন দলিল ও চিঠিপত্রে এরকম বয়ান দিয়েই সুরু করা হত কাজের কথা।

'এথা আমার কুশল তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্চাকরি'—এ পর্যন্ত বেশ সরল বাংলা। আধুনিক বাংলার সঙ্গে প্রভেদ এইটুকু যে বাঞ্ছার বদলে ভুল বানানে বাঞ্চা শব্দের ব্যবহার।

অখন—এখন। পূর্ববাংলায় এর প্রয়োগ 'অখনও' আছে।

পত্রাপত্রি—বিশুদ্ধ প্রয়োগ, অনেকটা চিঠিচাপাটির মত।

গতায়াত—আধুনিক কাল হলে হয়ত আমরা যাতায়াত লিখতাম-কিন্তু গতায়াত শুদ্ধ প্রয়োগ, গত (=গমন) এবং আয়াত (=আগমন) অর্থাৎ যাওয়া-আসা—'চতুর্দিকে গতায়াত করে লোকগণ।' উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ—উভয়ের পক্ষে অনুকূল প্রীতিরূপ বৃক্ষের বীজ। এ তো যথেষ্ট অলংকৃত বাক্যাংশ।

অংকুরিত হইতে রহে—প্রীতির বীজ অংকুরিত হতে থাকবে। রাঢ়ীয় উপভাষায় 'হইত রহে' এই ধরনের যৌগিক ক্রিয়াপদ নেই। তোমার আমার কর্তব্যে সে বান্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক—তোমরা এবং আমার যা করণীয় তা যদি করা হয় তবে অংকুরিত প্রীতির বীজ বৃদ্ধি পেয়ে (বন্ধিতাক পাই) ক্রমশ পুষ্পিত হয়ে উঠবে, ফলবতী হয়ে উঠবে। বৃদ্ধি অর্থে বর্দ্ধিতাক ও অসমাপিকা পাইয়া অর্থে পাই প্রয়োগ যেমন লক্ষণ তেমনি লক্ষণীয় ফলবতী অর্থে 'ফলিত' শব্দের ব্যবহার। এখন ফলিত শব্দের অর্থ কত দূরে সরে এসেছে!

আমরা সেই উদযোগতে আছি—সেই চেষ্টায় নিরত। কিন্তু উদযোগ শব্দের পর সপ্তমী বিভক্তি 'এ'—না দিয়ে 'ত' এর ব্যবহার কি কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্য নয়? অবশ্য কামরূপীতে 'তে'র বদলে 'ত' এর ব্যবহার বেশি। 'টেবিলে' 'ঘরে' না বলে কামরূপীতে 'টেবিলৎ' 'ঘরৎ' এই জাতীয় প্রয়োগ বেশি করা হয়।

'তোমারো'—অর্থ 'তোমারও'। রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'তারি' 'আমারো' এসব প্রয়োগ করেছেন যেমন 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

এ গোট কর্তব্য—এই কর্তব্যটি। একটি অর্থে গোটা বা গুটে ওড়িয়াতে এখনও রয়েছে একটি মানুষ বলতে 'গুটে মনুষ্য'। তোমারও এই কর্তব্যটি করা উচিত। শেষের 'হয়'-টি আজকাল আমরা বর্জন করেছি।

'না কর তাক আপনে জান' অর্থ যদি এই কর্তব্য পালন না কর তাহলে তুমি নিজে তা বুঝবে, তার দায় তোমারই। 'তাক'—সেই কাজটি। 'আপনি' বা 'নিজে' অর্থে আপনে প্রাচীন কামরূপীয় উপভাষার ব্যবহার।

'অধিক কি লেখিম'—লিখব অর্থে 'লেখিম' এই প্রয়োগও নিশ্চয়ই কামরূপীয় উপভাষার। উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে যে 'ব' 'অ' 'তব্য' থেকে জাত—এই 'ব' হাজার বছর আগেই বাংলায় এসে গেছে যেমন চর্যাপদে 'জাইব পুনু জিনউর' আবার জিনপুর যাব [যাতবং পুনঃ জিনপুরম্]। কিন্তু 'ম' বিভক্তি মধ্যযুগের বাংলার আঞ্চলিক উপভাষাতে 'ব'-এর পরিণতি। প্রথমে 'ব' পরে স্বতো-ন্যাসক্যাভবনে 'ব°' তার থেকে 'ম'।

ইমরাক অর্থে এদেরকে। ই'হারা > ইমূহারা > ইমারা ইমরা তার সঙ্গে-'কে' অর্থে 'ক'।

তামরার—তাঁহাদের অর্থে। এ ক্ষেত্রেও তাঁহার > তামূহারা > তামরা। 'তামরা'-র সঙ্গে সম্বন্ধে-'র'। কামরূপী উপ-ভাষায় এখনও এ জাতীয় ব্যবহার দুর্লভ নয়।

চিতাপ বিদায় দিবা—চিতাপ নিশ্চয়ই শীঘ্র অর্থে। বিদায় দিবা অর্থে সত্বর পাঠিয়ে দেবে।

দিয়া গাইছে—দেওয়া গিয়াছে। রাজকীয় ভাষা বলেই ভাববাচ্য। আরু—আর। বুজি কহি পাঠাইবেক। বুঝে যা বলবার বলে পাঠিও। 'পাঠাইবেক' র শেষের 'ক' টি নিশ্চয়ই স্ব-অর্থেই। এ প্রয়োগ রাঢ়ী উপভাষাতে অনেক পেয়েছি! বিদ্যাসাগরের সাধু গদ্যে যাইবেক, দাড়াইবেক ইত্যাদিও স্থান লাভ করেছে।

তোমাব অর্থে—এক্ষেত্রে 'অর্থে' মানে জন্যে, উদ্দেশ্যে।

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থতা

চিঠিটি কিন্তু বিবদমান রাজ্য দুটির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কস্থাপন করতে সহায়ক হয়নি। তার জন্য চিঠির ভাষা দায়ী নয়। দায়ী সম্ভবত উপহৃত বস্তুগুলির তুচ্ছতা। সে কারনেই আহোম রাজমন্ত্রীর একটি সৌজন্যমিশ্রিত কড়া উত্তর চলে এল। তার মূল কথা তোমার পাঠানো তুচ্ছ উপহার

গ্রহণ করলাম না। এর অর্থ কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক, শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করা গেল না।

আহোমরাজের চিঠি

আহোমরাজের দেওয়া উত্তরটি এই :

স্বস্তি ত্রিপুরহরচরণস্মরণশ্রীপর্ণসুধাপানভৃঙ্গায়মানসম্মান দানসন্তানশৌর্যধৈর্য্যগাম্ভীর্যৌদার্য্যপারাবারতুহিনকরনিকরতরঙ্গিণীতরঙ্গপাণ্ডরযশোরাশিবিরাজিতকুলকমলপ্রকাশৈকভাস্কর শ্রীমল্লনারায়ণরাজমহোদারচরিতেষু

লিখনং কার্য্যঞ্চ অত্রকুশল। তোমার কুশলবার্তা শুনিয়া পরমাপ্যাতি হৈলোঁ। আরু যে লিখিছা প্রীতিবৃক্ষ অংকুরিত সেয়ে তোমার আমার সাহ্যাদেত বৃদ্ধিক পায়া ফলিত পুষ্পিত হৈবার খান যি কহিছ ই গোট বিশেষ। কিন্তু তোমার আমার প্রীত যি হত হন্তে ঘাটছে সমস্তে জান। সেহরূপ মর্য্যাদা ব্যবহারত যদি রহিব ফলিত পুষ্পিত কিসক নহৈব। আমরা পূর্ব্ব অভিপ্রায়তে আছি। আরু উকিলর সঙ্গে যি সকল দ্রব্যাদি পাঠাইছিলা ই সকল সভাত দেখাইবার উচিত ন হয় কিন্তু যি সকলে যি হক আচরি থাকে অনীতি হৈলেও আচরণীয়ক লৈ তাকে নীতি স্বরূপে দেখে এতেকে দিবার পোবা আরু সমুচয় সেই সেই দ্রব্যত প্রবর্তনীয় লোকের দ্বারায়ে যি বুজুবা গৈছে সেইরূপে বুজিবা। তোমার উকিলর সঙ্গে আমার ডাকল শ্রী চন্ডীবর ও শ্রী দামোদর শর্ম্মাক পাঠোবা গৈছে এমরার মুখে সকল সমাচার বুজিবা। তোমার অর্থে সন্দেস নড়া কাপোর ২ থান গজদন্ত ৪ গাঠিয়ন ২ মোনা পংহুছব। শক ১৪৭৮ মাস আহার দিন ১০।

এ চিঠির ভাষার বৈশিষ্ট্য

এ চিঠিতে কামরূপী উপভাষার চাইতে কিছু বেশি পাচ্ছি। তা হল—যে স্তরে বাংলা-অসমীয়া মূল থেকে অসমীয়া পৃথক হতে সুরু করেছে সেই স্তরের ভাষারূপটি। নরনারায়ণের চিঠির ভাষা থেকে তা অবশ্য খুব বেশি আলাদা নয়। মিল আছে অমিলও আছে। দীর্ঘ সংস্কৃত সমাস বন্ধ পদে সম্বোধনের ব্যাপারে দুই চিঠিই পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী। রাজকীয় সম্বোধন তো!

লিখনং কার্য্যঞ্চ অত্র কুশল দিয়ে কাজের কথা লেখা ও কুশল জানানো সেরেই তোমার কুশলবার্তা শুনিয়া পর্যন্ত গণ্ডগোল নেই। পরমাপ্যাতি হেলো মানে পরম আপ্যায়িত হইলাম। উত্তম পুরুষে-'লো' মানে এখনকার—লুম বা লাম। আ-ম বিভক্তির সানুনাসিক্যীভবনের দ্বারা ব্যাপারটি সম্ভব হল। মধ্যযুগের বাংলায় এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। 'কলবতী সতী হৈয়া দুকূলে দিলো দুখ' বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে 'তৈঁছে এক কণ আমি ছুইলোঁ লীলার'। 'আরু' আর অর্থে এখনও পর্যন্ত কামরূপী উপভাষা এবং অসমীয়াতে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। প্রাচীন বাংলায় মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদে ও-কারের জায়গায় আ-কারের ব্যবহার আছে যেমন দিবা, লিখিবা, জানিবা ইত্যাদি। 'সাহ্যাদেত' সাহ্যাদে অর্থে-এ-কারের জায়গায় ত এর প্রয়োগ আগেই দেখেছি। যি কহিছ ই গোট বিশেষ—যা বলেছ তা একটা কথার মত কথা, idiomatic প্রয়োগ নিশ্চয়ই। যি—যে। প্রীতিগোট—প্রীতির ব্যাপারটা। সেইরূপ মর্য্যাদা ব্যবহারত যদি রহিব—'ব্যবহারে যদি উপযুক্ত মর্য্যাদার পরিচয় থাকে' এই হল অর্থ। 'ত' সপ্তমী বিভক্তিতে। কিসক নহৈব মানে 'কেন হবে না?' আধুনিক অসমীয়াতেও নিষেধার্থক 'ন' শব্দটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে। সমগ্র বাংলা দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ বঙালী উপভাষার কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখা যায়—যেমন নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে 'ন করস' মানে করিস না। অভিপ্রায়তে—অভিপ্রায়ে সপ্তমীতে 'এ' র বদলে 'তে' এইটুকুই মাত্র আধুনিক বাংলার সঙ্গে পার্থক্য। উকিলর সঙ্গে—পদান্তের অ-কার বাংলায় ক্রমশ কমে এসেছে তাই এখন উকিলের সঙ্গে বলি। মধ্যযুগে তা হত না। সভাত—সভাতে যে সব দ্রব্য কোচরাজা পাঠিয়েছিলেন তা রাজসভাতে দেখানো উচিত নয়। হয় না অর্থে 'না হয়' বাক্যাংশের ব্যবহার আধুনিক অসমীয়াতেও আছে। 'যি হক আচরি থাকে'—যে রকম আচরণ করে থাকে। আচরণীয়ক লৈ—আচরণীয় নীতির খাতিরে। এতেকে—এ জন্য। সমুচয়—সমুচ্চয়। দিবার পোবা—দেওয়া উচিত বোধ করবে। প্রবর্তনীয়—ফেরৎযোগ্য। 'দ্বারা' অর্থে 'দ্বারায়ে'-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যি বুজুবা গৈছে সেইরূপ বুজিবা—যা বুঝিয়ে দেওয়া গেছে তাই বুঝবে। পাঠোবা গৈছে—পাঠানো যাচ্ছে—hereby sent। এমরার—এঁদের।

প্রথম চিঠিটি এসেছিল ১৪৭৭ শকাব্দ (=১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) এর আষাঢ় মাস। এই উত্তর ১৪৭৮ শকাব্দের (১৫৫৬) ১০ই আষাঢ় (=আহার) এসেছিল।

আপনি/তুমি

একটা কথা নিশ্চয় এতক্ষণে মনে হবে—আধুনিক কালে হলে এ সব চিঠিতে এঁরা পরস্পর পরস্পরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু তা এঁরা করেন নি। পরস্পরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। এই সম্ভ্রমার্থক সর্বনামে আপনি'র ব্যবহার কিন্তু আধুনিক। আগে 'আপনি' ছিল 'আত্মবাচক', নিজে অর্থে। যেমন 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।' নরনারায়ণের চিঠিতে যেমন পেয়েছি 'না কর তাক আপনে জান'। এই 'আপনি' নিজে অর্থে 'আত্মন্' শব্দের বিবর্তনে এসেছে। আত্মান্ > আত্ম > অত্তঅ > প্প বা অপা (তুং চর্যাপদে ন জানমি অপা কাঁহি গই পইঠা) কর্তৃকারক ছাড়া অন্যত্র 'ন'

চলে আসে। 'অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা' এখানে অপণে করনকারকে প্রযুক্ত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development of Bengeli Language* বা *ODBL* থেকে প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিই ঃ

The extension of the sense from the Reflexive to the Honorific (second) personal pronoun is a recent thing in NIA. It is absent in MIA. It is not found in OB and eMB., nor in older literature in the other NIA tongues. In Early Bengali documents (e.g. in the letter of c. 1555 from the Koc king of north Bengal to the Ahom king of Assam.) তুমি, তোমার <tumi, tomara> are used as respectful or honorific forms, not আপনি <apani> as in MB or <apuni> as in Assamese.

[MIA—Middle Indo Aryan, NIA—New Ind-Aryan, OB—Old Bengali eMB—Early Modern Bengali]

ব্যর্থ দৌত্য

'দূতদল ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল।' সুতরাং আবার যুদ্ধ সুরু হল। মল্লদেব নরনারায়ণ এবং তাঁর ভাই শুকুল ধ্বজ বা চিলা রায় আহোম রাজকে পরাজিত করেছিলেন—কামাখ্যা মন্দিরের সংস্কার সাধন করেছিলেন—অনেক পরে আবার আহোমরাজ নিজরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কালের গর্ভে এসব যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী তলিয়ে গেছে কেবল গদ্য ভাষার বিবর্তনের এবং প্রাচীন সামাজিক ও রাজকীয় প্রথা সমূহের চিহ্ন নিয়ে চিঠি দুটি আমাদের ইতিহাসের অন্ধকারের মধ্যে দিক্‌দর্শিকা হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

সামাজিক ও রাজকীয় রীতিনীতি

রাজপুরুষদের উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে এক রাজা অপর রাজাকে কী চক্ষে দেখেন, কতটা সম্মান দেন, কতটা কাকে দেওয়া উচিত তার একটা অলিখিত নিয়ম বা Protocol আছে। এসব নীতিনিয়মের অনুসরণেও ব্যত্যয়ের দ্বারা পারস্পরিক মনোভাব ধরা পড়ে।

গাভী বা ঘুড়ী (ঘোটকী) পাঠাবার মানে তাই আমরা বুঝি। কিন্তু বুঝি না উপহারের সঙ্গে 'চ্যাং' মাছ পাঠাবার অর্থ কি। ও মাছটির নাম মনসামঙ্গলে পেয়েছি। মনসা দেবীর নাম 'চ্যাং মুড়ী কানী'। যেহেতু মনসা দেবী সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর সাপের মাথা চ্যাং মাছের মুড়োর মত সেই জন্যই মনসা দেবীর এই রকম নাম। বুই নয়, কাতলা নয়, মৃগেল নয়, চ্যাং মাছ স্থান পেল উপহৃত বস্তুর মধ্যে ? এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ? 'বালিচ' কি বালিশ ? সে ক্ষেত্রে তালব্য বর্ণ 'চ' এর 'স' এর মত উচ্চারণ লক্ষণীয়। কিন্তু বালিশও কি উপহৃত দ্রব্যের মধ্যে কোনও সম্ভ্রম জাগায় ? 'জকাই' অর্থে মাছ ধরা ছিপ (বংশ নির্মিত মৎস্য ধরা যন্ত্র বিশেষ—দ্র. কোচবিহারের ইতিহাস আমানতুল্লা, পৃ. ১০৪) উপহার হিসাবে এটাও বা কতটা লোভনীয় মনে করেছিলেন রাজা তা কে জানে। তবে আহোমরাজ যে করেন নি তা তাঁর চিঠিতেই প্রমাণ। সভাতে তিনি এসব উপহার দেখাতেই চান নি। আর শাড়ীর ব্যাপারে আসামের মন্ত্রী বড়গোহাই তীব্র বিরক্তিতে বলেছিলেন যে ওরকম শাড়ী তাদের দেশের বেশ্যারা পরে।

আমাদের সন্দেহ মল্লদেব ইচ্ছে করেই এসব বস্তু পাঠিয়ে কাল হরণ করতে চেয়েছিলেন, অসম্ভ্রমও দেখাতে চেয়েছিলেন। চিঠির ভাষা ও উপহৃত বস্তুর তুচ্ছতার বৈপরীত্যের মধ্যে রাজা Protocol মেনেই কূটনীতির চাল চেলেছিলেন।

উপভাষাতত্ত্ব

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন প্রকৃতপক্ষে সব ভাষাই কোনও না কোনও স্তরের উপভাষা। আঞ্চলিক উপভাষা, পেশাগত উপভাষা, সামাজিক স্তরের ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন উপভাষা। এইভাবেই ভাষাকে দেখতে হয়। এ অর্থে শিষ্ট গদ্যও একটি উপভাষা।

আমাদের উদাহৃত চিঠি দুটি আঞ্চলিক অর্থে বাংলার কামরূপীয় উপভাষার অন্তর্ভুক্ত। সেটার গৌরব এতটা ছিল যে রাজারা তাতে চিঠি দেওয়া নেওয়া করতে কোনও ভিন্ন বা শিষ্ট উপভাষা বা standard dialect এর শরণ নেন নি। আর সে রকম সর্ব সাধারণ গ্রাহ্য কোনও ভাষা তখনও তৈরিই হয়নি।

নরনারায়ণের সঙ্গে দিল্লীশ্বর আকবরের সদ্ভাব স্থাপিত হয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে মোগল শাসনকর্তারা কোচ-বিহারের দিকে বেশি এগোন নি। অন্যদিকে নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু দখল করতে পারেন নি।

যদি গৌড় দখল হত, যদি নরনারায়ণ বা শুকুলধ্বজের মত বীরও বিদ্যানুরাগীরা গৌড় সিংহাসন থেকেই তাঁদের পৃষ্ঠ-পোষকতা ছড়িয়ে দিতেন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তাহলে এমন হলেও হতে পারত যে রাঢ়ী উপভাষার বদলে কামরূপী উপভাষাই standard dialect রূপে আমাদের দেশে আমাদের সাহিত্যে গৃহীত হত। গদ্যের রূপ বিকশিত হত তাহলে আরও অনেক আগে। যে কোনও ভাষার মেরুদণ্ডই হল তার ঋজু নমনীয় অর্থবহ গদ্য। সেটা আরও যথেষ্ট আগেই গড়ে উঠতে পারত।

কিন্তু যা হতে পারত অথচ হয় নি—তা নিয়ে হা হুতাশ করে কী লাভ আর ?

মৃত্যু সমদর্শী

James Shirley-এর "Death the Leveller" কবিতার বঙ্গানুবাদ

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

বংশের গৌরব আর ঐশ্বর্য যত,
চিরন্তন নয় তারা—শুধু ছায়া মত।
কে রুধিবে অখণ্ড এ কালের লিখন
মরণের শীতল স্পর্শে স্তব্ধ হয় সকল রাজন্।
রাজদণ্ড নৃপতি মুকুট,
কখনো যে রহে না অটুট,
সব কিছু ধূলি সাথে এক হয়ে যায়
সামান্য কাস্তে আর কোদালের প্রায়।
মানের আবাদ কেহ করে অস্ত্র দিয়ে
ধ্বংস স্তূপে বিজয়েব চারাটি গাজয়ে।
কালক্রমে বিজয়ীর বীর্য কমে আসে,
তবুও সে অরিদের ক্ষমতা বিনাশে।

কেহ আগে কিংবা কেহ পরে,
যায় চলে কালের গহ্বরে।
যখনই বন্ধ হয় অন্তিম শ্বাস
বন্দী সম বাঁধি লয় মৃত্যুর পাশ।
শুকায় যে ললাট, 'পরে জয় মাল্যখানি,
মহান কীর্ত্তির যত অহঙ্কার হানি।
হের হোথা মরণের রাঙ্গা বেদী 'পরে
বিজিত ও বিজেতার রক্ত ধারা ঝরে।
উচ্চ শির ভূতলে লুটায়,
শীতল সমাধি মাঝে হায়!
একমাত্র সুকর্মের পূত শতদল
ধূলির ধরাতে দানে মধু পরিমল।

সূর্যের কালো রক্ত

বেঞ্জামিন মোলোইজ-এর উদ্দেশে

বার্নিক রায়

তোমার শত্রুর গুলি আমাদের বুকে এসে রক্ত
ঝরিয়ে দিয়েছে। কালো আদিম অরণ্যে হিংস্র শক্তি কি উধাও
করুণার সাদা গন্ধে? হে আদিম, হে হিংস্র কঠোর,
হে আগ্নেয় দীপ্ত লাভা, কালো দেহে জাগো, জাগো: পৃথিবীর
রক্তের কণিকা বুকে এসে আমাদের শক্তি দিক,
হে ধরিত্রী, তোমার কি ধারণের শক্তি নিঃশেষিত,
তোমারদেহেরকোষেকোষেভালোবাসারপবিত্ররক্ত,তবুতুমি স্থির!

তাই কি পাণ্ডুর দেহ নিয়ে মৃত সূর্য মর্ত্যে দেখে
নীরবে শুধুই আলো দেয় অরণ্যের সবুজ পাতার
নিবিড় রহস্যে? সূর্য! তোমার হিলিয়াম কি শেষ! নইলে,
স্বদেশ প্রেমের আলো মরে কেন? আমরা বিশ্বের
মানুষ নিজের রক্ত ঢেলে পৃথিবী ও সূর্যকে দীপ্ত
করবো করুণ কালো গন্ধের নিষ্ঠুর ধর্ম নিঃশেষ করতে।

বাংলা সাময়িকপত্রে চিত্রকলার ক্রমবিবর্তন

অসীম রতন ঘোষ

১৯০৭ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা গড়লেন 'দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট'। প্রদর্শনী আর অন্য উপায়ে শিল্পীর প্রকাশে ও বিকাশে এই সংঘ সাহায্য করতো। সোসাইটি, প্রদর্শনী কক্ষ, গোষ্ঠী সব কিছুর সংখ্যাই বেড়েছে—শিল্পীর সংখ্যাও প্রচুর। এক অদ্ভুত অস্বচ্ছ ব্যবধা দর্শক ও শিল্পীকে দূরে সরাচ্ছে ক্রমশঃ। চিত্র সম্পর্কে এক প্রবল অনীহার সাধারণ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে অন্য শিল্পমাধ্যমের আপন জনেরাও। সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত সব শিল্পই বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলে অনেকখানি সাময়িক দূরত্ব অতিক্রম করে হাজার মানুষের কাছে আসতে পারে। চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই ব্যবধা অসঙ্গত ; তবে সম্ভাব্য উৎসের মধ্যে দূরদর্শন ও সাময়িক পত্রগুলির অবহেলা উজ্জ্বল। নবীন মাধ্যম, দূরদর্শন বাঙালী জীবনের সঙ্গে মেশেনি তো বটেই, সমান্তরালভাবেও প্রবাহিত হয় না। শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সাময়িক পত্রগুলি শিল্পীর আঁকা ছবি জীবনধারার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনে দিয়েছিল। সেই সময়ে এক বা একাধিক 'ত্রিবর্ণ চিত্র' বুকে নিয়ে 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'মাসিক বসুমতী', 'বঙ্গবাণী', 'বিচিত্রা', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' প্রকাশিত হত। বর্তমানে বাংলার কোন পত্রিকা শিল্পীর মৌলিক ছবি নিয়মিত ছাপেনা।

এই আলোচনা ১৯০০—১৯৪০ সাল সময়কালে বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবিগুলির ভিত্তিতে, এবং উল্লেখযোগ্য-গুলিকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে, বাঙালী শিল্পীদের বিষয় নির্বাচন, শিল্পপ্রকরণ, দেশীয় সম্পদের প্রয়োগ, বৈদেশিক প্রভাব, সমাজ সচেতনতা, শিল্পীর মানসিকতা এই সব বিষয়ে, পারিসরিক স্বল্পতার কারণে ধারাবাহিক ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা না করে পরিচিতি ও কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যাবে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুঠো থেকে মহারাণীর থাবায় আসার পর দিল্লীর লালকেল্লা এবং আহমেদাবাদ, এলাহাবাদ সহ ভারতের বিভিন্ন শহরের সমস্ত ঐতিহাসিক দুর্গ এবং সব স্থাপত্য সৌধগুলি নষ্ট হচ্ছিল ইংরেজের অবহেলা এবং অত্যাচারে। ভারতের ঐতিহ্য রাজপুত, মুঘল ও কাংড়া চিত্রকলা লুট হয়ে গেল। তারা এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বন্দী। সান্ত্বনা দিতে অথবা সম্ভবতঃ ইয়োরোপের শিল্পের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তৈরি হল কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়াম আর বোম্বাই-এ প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স মিউজিয়াম। এখানে রইল হয়োরোপীয় ছবির পাশে ভারতীয় ছবি। ঘটনাটা তাৎপর্যপূর্ণ। ঘন অন্ধকারের মধ্যে এই জোনাকির আলো ভারতীয় শিল্পীদের সুযোগ, সাহস ও উৎসাহে পূর্ণ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিত্রকলা রীতির মিলনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের চারিত্রিক শিল্প ধারার জন্ম দিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেরু দূরত্ব আরও একবার স্পষ্ট হয় এই সময়ের বাংলা ছবি ও ইয়োরোপের ছবির তুলনা করলে। ক্যামেরা আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে আর সফলতর সংযোগ মাধ্যম তৈরি করতে ঐ সময়ে রিয়ালিস্টিক ছবির বদলে অন্য ধরণের ছবি আঁকা হতে লাগল। একে একে এল ফভিজম (রং ও বিষয়বস্তুর মাত্রাতিরিক্ত আবোল তাবোল প্রয়োগ), কিউবিজম (প্রাকৃতিক বস্তু তার একটি মাত্রা হারালো আর কিছু জ্যামিতিক রূপকল্পনায় ভাঙা হল এবং তা এমনভাবে জোড়া হল যেন বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে একটি জিনিষকে দর্শক দেখছে), সুরিয়ালিজম (অবচেতন মনের চিন্তা ও স্বপ্নের অদ্ভুত শিশুসুলভ চিন্তাকে এঁকে সংযোগের গভীরতর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলো), একস্‌প্রেশনিজম (আবেগ অনুভবকে বর্ণ ও বিন্যাসের বিকৃতি দিয়ে প্রকাশ), ফিউচারিজম (যার মূল বাণী এই যে অতীত অন্তঃসারশূন্য

এবং বর্তমান মহান), এবং আরও পরে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট, অ্যাকশান পেইন্টিং মিনিমাল আর্ট পপ আর্ট এবং অপ আর্ট। এই সময়ে ভারতীয় শিল্পীরা কোন পরীক্ষামূলক শিল্পের বদলে ঐতিহ্যের কাছে ফিরে এলেন। দ্বিমাত্রিক পারস্পেক্টিভ-হীন পার্শিয়ান ছবি, মুঘল ছবির মতো পাশ থেকে দেখা মানুষের ছবি, রাজপুত চিত্রকলার রৈখিক (লিনিয়ার) ছবি অলংকৃত গাছ, মানুষের টানা টানা চোখ—এ সব কিছুই তাদের প্রভাবিত করলো ভীষণ ভাবে। পাশ্চাত্য প্রভাব সীমায়িত থাকল বাস্তববাদী ক্যালেন্ডারের মতো ছবির মধ্যে।

সেই সময়ের বাংলাদেশের শিল্পীরা কখনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকেছেন। তাতে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির প্রতি মানুষের অনুভূতি আর প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। কখনও ছবি এঁকেছেন ইতিহাসের বিষয় নিয়ে, কখনও এঁকেছেন মানুষের ছবি।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তাঁরা এঁকেছেন। এক স্বতন্ত্র জীবন স্রোত, গাছপালা, পশুপাখি, নদীঝরণার জীবন প্রবাহ, তাঁরা দেখছেন শিশুকাল থেকেই—এই সৃষ্টি ত মানুষের মতোই শাশ্বত। তাই প্রকৃতির সঙ্গে কৌতূহল, শ্রদ্ধা, ভয়, আনন্দ সব কিছু মিশে আছে। বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন শিল্পীর দ্বারা প্রাকৃতিকে নানারকম ভাবে দেখা এবং দেখানো হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নানা রকম। এই সান্নিধ্য বোঝাতে সমস্ত ভারতীয় ছবিতেই দেখা যায় দৃশ্যমূলক পারস্পেক্টিভের অভাব, মানুষ ও প্রকৃতি সমান পুঙ্খানুপুঙ্খতায় চিত্রিত।

পুরোনো ধারাকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে সিদ্ধেশ্বর মিত্রের 'আলোছায়া' (বিচিত্রা, ১৩৩৫), প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বিপ্রহর' (বিচিত্রা, ১৩৩৫) এবং উপেন্দ্রনাথ ঘোষ-দস্তিদারের নামে 'সন্ধ্যা তন্দ্রালসা' (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) আঁকা হয়েছে।

মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে ছবি এঁকেছেন বীরেশ্বর সেন—'মহাশ্বেতা' (মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৪)। গেরুয়া বসনে বসে আছে এক নারী, মাথার পিছনে হলুদ বলয় বা হেলিক্স (আকবরের সময়ে বাইজেন্টাইন শিল্প থেকে ভারতীয় ছবিতে হেলিক্স এসেছিল)। দ্বিমাত্রিক ছবি, এতে অন্ধকার নতুন মাত্রা পেয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'রবিঠাকুর' ছবিতে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন; ভোরবেলার লালরঙে ভরে গেছে চারদিক—প্রাচ্যরীতিতে আঁকা (মানসী ও মর্ম্মবাণী পৌষ, ১৩২৪)। এছাড়া এঁকেছেন সারদা চরণ উকিল, 'চাঁদনি রাতে' (ভারতবর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৩২), প্রাচ্যকলাসম্মত রীতিতে; এ. আর. আসগর, 'মেঘসঞ্চার' (ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৩২), পূর্ণচন্দ্র সিংহর, 'গোদাবরী তীরে' (ভারতবর্ষ ১৩৩২) বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় 'অরণ্যানী' (প্রবাসী ১৩৩২)।

ঐতিহাসিক ছবির শিল্পমূল্য ছাড়া আরও কিছু গুরুত্ব আছে সমকালীন ঘটনায় শিল্পীর অনুভব ভবিষ্যতের জন্য সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যে রু ট্রান্সোনিয়ান বা গ্যের্নিকা আঁকা হয়েছিল মানুষের পাশবিক আক্রমণ, অত্যাচার ও হত্যার প্রতিবাদে। ১৯৭০-এ আমেরিকার পপ আর্টিস্ট রবার্ট রোজেনবার্গ 'সাইন্স' ছবিটি এঁকেছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে। বাঙালীর এই বিষয়ে সচেতনতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ছবিতে আদৌ দেখা যায় না। স্বাধীনতা নিয়ে প্রায় কোন ছবিই আঁকা হয়নি। একটি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ—'স্বাধীনতার স্বপ্ন' (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২)।

পৃষ্ঠপোষকের জন্য আঁকা ছবিগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। ইতিহাসের কিছু অনন্ত মুহূর্তে নিয়ে চিত্রের অবয়ব নির্মিত হয়েছে খুব কম। উল্লেখনীয় তিনটি ছবিই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা: প্রবাসীতে প্রকাশিত 'শাহাজাহান' ও 'তাজ' এবং বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত 'দর্শন দরবাজাতে আলমগীর'।

পুরাণের ঘটনা নিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে কিছু। দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি—ভারতীয় রীতি ও জাপানের 'ডেকোরেটিভ আর্ট'-এর মিলনে নির্মিত বীরেন্দ্র কৃষ্ণদেব বর্মার 'গরুড়ের সুধাভাণ্ডহরণ' (প্রবাসী ১৩৩৫) ও সারদা চরণ উকিলের 'অশোক বনে সীতা' (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)।

ভারতে ধর্মের কারণে মুসলমান যুগের প্রথম দিকে মানুষের ছবি আঁকা হত না। আকবরের সময় থেকে ব্যাপকভাবে আঁকা হতে লাগল। তার আগে অবশ্যই রাজপুত, কাংড়া পারশিয়ান ছবিতে মানুষ তার অনুভূতি নিয়ে ছবিতে উপস্থিত ছিল মানবিক অনুভূতির বিভিন্ন ছবি এঁকেছেন বাঙালী শিল্পীরা। যেমন, ভবানী চরণ লাহার 'চিন্তামগ্না' (মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন ১৩৩২): রিয়ালিস্টিক এই ছবিটি বসে-থাকা নারীটির শরীরের ভাষায় ও আভাসে বক্তব্য পৌঁছে দেয় খুব সহজে। হরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'জননী' প্রাচ্য-রীতিতে আঁকা আলো ও ছায়ার প্রয়োগ সমৃদ্ধ ছবি (মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩২৭)। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মিলন স্বপ্ন' (বসুমতী ১৩৩৫), উপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদারের 'ব্যর্থ অভিসার' (ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৩৫), ইন্দুভূষণ চৌধুরীর 'প্রতীক্ষা' (বসুমতী আশ্বিন ১৩৩৫), সিদ্ধেশ্বর মিত্রের 'জীবন ও প্রেম' (বিচিত্রা শ্রাবণ ১৩৩৬), নন্দলাল বসুর 'মধ্যাহ্নে প্রতীক্ষা' (প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৫) আরও কিছু মনে রাখার মতো ছবি। ইয়োরোপের বহু বিখ্যাত ছবির প্রভাব এই সব ছবিতে পড়েছে।

পৌরাণিক চরিত্রগুলির ছবি আঁকতে গিয়ে ভারতীয় রীতির সঙ্গে ইয়োরোপীয় রীতি এবং চীন ও জাপানের চিত্র প্রকরণ মিলে মিশে একাকার হয়েছে। দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'একলব্য'তে (ভারতবর্ষ বৈশাখ ১৩৪১) চরিত্রেরা দ্বিমাত্রিক, সামান্য পারস্পেক্টিভ রয়েছে, তাতে প্রাথমিক রঙের আধিক্য

আর অর্জুনের দেহের হালকা নীল রং।

প্রাচ্য রীতিতে আঁকা, জাপানী আলংকরিক শিল্প-প্রভাবিত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'অভিমন্যু' (ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৩২), এই শিল্পীর-ই রিয়ালিস্টিক ধাঁচে আঁকা ছবি 'মিলন' (ভারতবর্ষ কার্তিক ১৯৩২) ; নন্দলাল বসুর উজ্জ্বল ছবি 'গোপিনী' ভবতারণ দে-র 'মীরাবাঈ' রঙ ও রেখার ভঙ্গীতে বৈচিত্র্যময় পুলিনবিহারী দত্তের 'ভিক্ষুবুদ্ধ' (প্রবাসী কার্তিক ১৩৩২) ছাড়া এই পর্যায়ের আরও কিছু ছবি 'শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত' (হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাসিক বসুমতী ১৩৩৫), 'প্রবুদ্ধ বুদ্ধের বুদ্ধ চেতনা' (নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ), 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' (সিদ্ধেশ্বর মিত্র, ভারতবর্ষ) 'বুদ্ধ' (গৌরীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণী, প্রবাসী), এবং সারদাচরণ উকিলের 'শ্রী শ্রী কালী' (প্রবাসী ১৩২৩)।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ছবি এঁকেছেন অনেক শিল্পীই। এরকম একটি ছবি সিদ্ধেশ্বর মিত্রের 'পথিক'—লাঠি আর পুঁটুলি হাতে পথিক এগিয়ে চলেছে অন্ধকার-হয়ে-আসা উঁচু-নিচু পথ দিয়ে (মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্তিক ১৩৩২)। এটি প্রাচ্য কলা রীতিতে আঁকা। আরও কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি : চঞ্চল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদর্শস্বামী' (বিচিত্রা ১৩৩৫), সারদা চরণ উকিলের 'ঘাতক' (ভারতবর্ষ), পূর্ণচন্দ্র সিংহের 'কবি' (ভারতবর্ষ), রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ভিখারী' (প্রবাসী) শিবপদ ভৌমিকের 'দীপ্তা' (বসুমতী), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পতিদেবতা' (বসুমতী) ও শ্রীঠাকুর সিং এর 'তুমি কোন কাননের ফুল' (বসুমতী)।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিল্পীরাও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি এঁকেছিলেন ইয়োরোপীয় রীতিতে। এঁরা হলেন এডমণ্ড দুলাক, সিএ ইস্টলেক এবং ডি এইচ পিকারসনাইট।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবির অনেকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে। তবু এরা এদেশের শিল্প আন্দোলনে বিখ্যাত-অবিখ্যাত সমস্ত শিল্পীদের শিল্প চর্চার একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস মহাকালের পটে এঁকে রেখেছে অম্লান ভাবে।

PRESIDENCY COLLEGE

প্রযুক্তি প্রসঙ্গ :
তৃতীয় বিশ্ব ও পশ্চিমী মারীচ

অনির্বাণ ময়ূখ সেনগুপ্ত

জীবনের ধর্মই বিকশিত হওয়া ; বিকাশের পথ রুদ্ধ হলে বিকৃতি ও জড়তের মাধ্যমে মৃত্যুর সূচনা হয়। স্বীয় মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিগুলির সুসমঞ্জস বিকাশই মানব-জীবনের মূল লক্ষ্য। এই প্রবণতা সর্বজনীন, তাই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য যথাযথ সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন। বস্তুতঃ কাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থার জন্য নিরন্তর অন্বেষণের ইতিবৃত্তই সমাজবিবর্তনের ইতিহাস। এটা স্পষ্ট যে, হিংসা, শোষণ, স্বৈরাচার, কেন্দ্রিকতা, বৈষম্য, করণের যান্ত্রিকতা ও বিশালতা এবং বিচ্ছিন্নতা সুষম সামগ্রিক বিকাশের পরিপন্থী। চরম অভাব ও অতৃপ্য বিষয়তৃষ্ণা—উভয়ই এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক। বিষম সমাজে পরস্পর 'স্যাডো-ম্যাসোকিস্টিক্' সম্পর্কে আবদ্ধ উৎপীড়ক ও উৎপীড়ত উভয়েই হীনম্মন্য, নিঃসঙ্গ ও অসহায় এবং ফলতঃ বিভিন্ন ধরনের বিকৃতির শিকার। মানবজাতির বহুযুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সাধারণভাবে বলতে পারা যায় যে, প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের কাম্য বিকাশের জন্য গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রী-করণ ও সমবায়নীতির ভিত্তিতে গঠিত শোষণহীন সমসমাজই কাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থা। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা সংক্ষেপে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ব্যবস্থা বলতে পারি। ভারতের মত দরিদ্র, জনবহুল, কায়েমীস্বার্থ, গ্রামপ্রধান দেশগুলিতে এই কাম্য সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মৌল চাহিদার পূরণ এবং দারিদ্র্য, কর্মহীনতা ও বৈষম্য দূরীকরণ করতে হলে যে উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। বাঞ্ছিত প্রযুক্তিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য, উদ্ভাবন ও প্রয়োগই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রযুক্তিবিদ্যা কী ? প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদের সহায়তায় স্বীয় বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ভৌত পরিবেশ আয়ত্ত, বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করার মানবিক প্রয়াসকেই আমরা প্রযুক্তিবিদ্যা বলি। স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে এসেছে। তবে আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে প্রযুক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গভীরতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা তুলনা-মূলকভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা। বর্তমানে প্রযুক্তির উদ্ভাবন, নির্বাচন ও প্রয়োগ কোন বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়, তা সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। সেই কারণে প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা ও উপযোগিতা বা কাম্যতা বিচারের জন্য যথার্থ মানদণ্ডের প্রয়োজন। ব্যাপকতম অর্থে স্থানিক পরিবেশই এই বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে স্থানিক পরিবেশ বলতে শুধু ভৌত ও অর্থনৈতিক পরিবেশই নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সরকারী নীতি, বেসরকারী লক্ষ্য এবং সামগ্রিক সামাজিক আদর্শ-এ সব কিছুর প্রতিই নির্দেশ করা হচ্ছে। স্থানিক পরিবেশ উৎপাদন প্রযুক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি—এ দুয়েরই নির্ধারক। এর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে নিয়ন্ত্রক ও নির্ণায়ক এই দুই ধরনের ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। তবে কতগুলির মধ্যে নির্ণায়ক ক্ষমতা প্রধান —যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। আবার কতগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাই প্রধান—যেমন শ্রমিক ও মালিকের মানসিক প্রবণতা, ভোক্তাদের স্বভাব ও পছন্দ ইত্যাদি। প্রধানতঃ নির্ণায়ক ক্ষমতা বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে কাম্যরূপ দিয়ে ও উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে বাঞ্ছিত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনই যথার্থ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, যে পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তি বিদ্যা যান্ত্রিকীকরণ এবং ভারী ও বৃহদায়তন শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকা, ব্রিটেন, পশ্চিম ও মধ্য য়ুরোপের দেশগুলিকে এবং পরবর্তী কালে রাশিয়া ও জাপানকে (যদিও জাপানের ক্ষেত্রে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত

হয়) প্রভূত প্রাচুর্যের অধিকারী করেছে, সেই প্রযুক্তিবিদ্যাই বর্তমান পৃথিবীর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে শুধু উপযোগীই নয়, অপরিহার্য বটে। দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে এই মোহ স্বাভাবিক; কিন্তু এই প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা ও কাম্যতা বিচার না করেই তা গ্রহণ করা অযৌক্তিক। (এই প্রযুক্তিকে আমরা পশ্চিমী প্রযুক্তি বলব। এই পশ্চিমী প্রযুক্তির ব্যবহার ও তাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী-কম্যুনিস্ট ভেদাভেদ নেই। পশ্চিমী ধাঁচে অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কম্যুনিস্ট চীন প্রথমে অন্যপথে গেলেও বর্তমানে পশ্চিমমুখী হয়েছে।)

সাধারণভাবে পশ্চিমী প্রযুক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক্। এই প্রযুক্তি অত্যন্ত পুঁজিনিবিড় হওয়ায় শিল্পায়নের সূচনা ও প্রসারের সময় প্রভূত পুঁজির প্রয়োজন হয়। এই বিরাট পরিমাণ পুঁজি স্বাভাবিক সঞ্চয় থেকে পাওয়া যায় না। ফলে তা তীব্র শোষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু কোন দেশ যদি সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তর শোষণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়, তবে সে দেশের সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং ফলতঃ উৎপাদিত বস্তুর বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসবে। এই অবস্থা শিল্পপ্রসারের পক্ষে অনুকূল নয়। য়ুরোপের দেশগুলি, বিশেষ করে ব্রিটেন, এই সমস্যার একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর সমাধান খুঁজে পেয়েছিল। তা হল: প্রথমে দূরপাল্লার 'বাণিজ্যের' মাধ্যমে ও পরে নির্মম, বিধ্বংসী ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে প্রাচ্যের দেশগুলির সম্পদলুণ্ঠন। যে দেশগুলির তেমন কোন উপনিবেশ ছিল না, সে দেশগুলিও পশ্চিমী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই লুণ্ঠনের অংশভাক্ হয়েছিল। কোন কোন দেশে স্বীয় জনগোষ্ঠীর একটি বিশেষ অংশকে এই উদ্দেশ্যে তীব্রভাবে শোষণ ও পীড়ন করা হয়েছে: আমেরিকার অশ্বেতকায় জনগোষ্ঠী ও পরবর্তীকালে স্ট্যালিনের আমলে রুশ কৃষিজীবীদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদ এই অর্থে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জনক, সহচর তো বটেই। ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যতিরেকে পশ্চিমী প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব নয়। ভিন্ন কারণে হলেও এই মৌল ধারণাটি নেহ বলেহ পুঁজিবাদী ও কম্যানিস্ট উভয়েই পশ্চিমী প্রযুক্তি সম্পর্কে নীতিগতভাবে নিরপেক্ষ। বিজ্ঞানের বিশ্বজনীনতা ও নীতিনিরপেক্ষতায় পশ্চিমী বিশ্বাস ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সেই বিশ্বাসের সম্প্রসারণও এই নৈতিক ঔদাসীন্যের একটি কারণ।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রবল অত্যাচারে উপনিবেশগুলির অর্থনীতি, প্রযুক্তি, সমাজ এবং সংস্কৃতি ধ্বংসাবশেষে পর্যবসিত হয়েছে, এতদ্‌সত্ত্বেও যে শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছে ঔপনিবেশিকতার প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায় নি, তার প্রমাণ নবউপনিবেশিকদের উদ্ভব। এক্ষেত্রে আক্রান্ত দেশগুলি আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হলেও প্রত্যেকটিতেই একটি আণুবীক্ষণিক পরজীবী গোষ্ঠী (ভারতের ক্ষেত্রে এক উচ্চবিত্ত, উচ্চবর্ণ, ইংরেজীনবিশ গোষ্ঠী) বিদেশী শক্তি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্রীড়নকরূপে স্বদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ ধারা অব্যাহত রেখেছে। নূতন ব্যবস্থায় শোষকেরা তাদের পূর্বসূরীদের মতই উদাসীন, অমানবিক ও নিষ্ঠুর, সম্ভবত চতুরতর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'ভূপাল' কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, নব-ঔপনিবেশিক শোষণের মর্মন্তুদ পরিণাম মাত্র। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যাতে পশ্চিমী মারীচের পিছনে ছুটে বেড়ায় ও ফলতঃ চিরকাল শিক্ষা থেকে সমরোপকরণ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমী দুনিয়ার অধমর্ণ রয়ে যায়, তা-ই এই চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য।

যে সব কারণে য়ুরোপ-আমেরিকা-রাশিয়া-জাপানে পশ্চিমী ধাঁচে অর্থনৈতিক উন্নতি সফল হয়েছিল, সেগুলি বর্তমান শতাব্দীর অনুন্নত দেশগুলিতে অনুপস্থিত। (আমরা অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলি, হংকং ও সিঙ্গাপুরের মত নগররাষ্ট্র এবং তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মত আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট দেশগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরছি না।)

প্রথমত: তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা আজ সম্ভব নয়, কাম্যও নয়।

দ্বিতীয়ত: ঐতিহাসিক কারণেই বর্তমানের উন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়নের সূচনায় জনপ্রতি আয় অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী ছিল, বৈষম্য ছিল কম এবং জনমহারও নীচু ছিল। এ ছাড়াও বর্তমানের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রও অনেক বেশী সুবিধা ছিল: প্রতিযোগিতা ও নিয়ন্ত্রণ দুই-ই ক্রমশঃ বাড়ছে।

তৃতীয়ত: যে সর্বগ্রাসী শোষণের মুখে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পড়েছে, তার ফলে পুঁজি নিবিড় প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা প্রায় বাতুলতায় পর্যবসিত হয়েছে।

পশ্চিমী মারীচের পশ্চাদ্ধাবনের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এক দ্বৈত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই ব্যবস্থায় দেশের অতলস্পর্শী দারিদ্র্যের মধ্যে নিরন্তর শোষণের মাধ্যমে বিষয়-বৈভবের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সৃষ্টি করা করা হয়েছে মাত্র। এই দ্বৈত ব্যবস্থার প্রতিফলন সমাজের সকল ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান।

যে ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার বিচারে পশ্চিমী প্রযুক্তি অযোগ্য বিবেচিত হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো কাম্যতার প্রশ্নটি না তুললেও চলে। তবুও একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পশ্চিমী ধাঁচের তৃপ্তিহীন ভোগবিলাসবহুল জীবনযাত্রা—যা পশ্চিমী প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—যে অকল্যাণকর, এ সত্য পশ্চিমেও অনুভূত হয়েছে। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন পদ্ধতির যান্ত্রিকতা, বিশালকায়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন, নিত্যনূতন অভাব সৃষ্টি, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ইত্যাদির ফলে

সাধারণ মানুষের ব্যক্তিজীবন বিধ্বস্ত ব্যক্তিমানস হীনম্মন্যতায় জর্জর, মানুষ নিঃসঙ্গ ও অসহায়, ভোত ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশদূষণ ক্রমবর্ধমান এবং সমাজ অসুস্থ ও অসুখী। ফলে সে সব দেশে মাদকাসক্তি, বিবাহবিচ্ছেদ, মানসিক বৈকল্য ও আত্মহত্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। তৃতীয় বিশ্বের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও, কিছুটা নির্বোধ অনুকরণের ফলে, এইসব 'রোগের' সংক্রমণ ঘটেছে।

যদি পশ্চিমী মারীচের পশ্চাদ্ধাবনের পরিবর্তে সমসমাজ গঠনই আমাদের কাম্য হয় (এবং তা-ই হওয়া উচিত), তবে সেই উদ্দেশ্যে যে উপযুক্ত প্রযুক্তির সৃজন করতে হবে তার কাঙ্ক্ষিত ভৌত ও আর্থসামাজিক লক্ষণগুলি কী? স্থানিক সুবিধা; সহজলভ্য প্রাচুর্য; ন্যূনতম অপচয়; ন্যূনতম দূষণ; পুনরুদ্ধার, পুনরুৎপাদন ও পুনর্নবীকরণের ভিত্তিতে শক্তির উৎস, কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের ব্যবহার; শ্রমের নিবিড় ব্যবহার; ক্ষুদ্র আয়তন ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্যাপক ও সুষমভাবে কর্মসংস্থানের প্রসার; সাধারণ মানুষের মৌল প্রয়োজন (কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টিসাধ্য ও সেই কারণে অতৃপ্য অভাববোধ নয়) মেটানোর জন্য সুষ্ঠু উৎপাদন-ব্যবস্থার এবং সুস্থ যৌথ জীবনযাত্রা ও আগ্রহপূর্ণ সমবায়ী অংশগ্রহণের সহায়ক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সংগঠন—এই শর্তগুলি মেনে ভারতের মত জনবহুল দরিদ্র অনগ্রসর দেশগুলিতে উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে হবে। এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুস্থ শোষণহীন কল্যাণকর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হবে, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এড়ানো যাবে, বৈষম্য দূর হবে এবং গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

সাধারণতঃ পশ্চিমানুসারী বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও রাজনীতিবিদরা এ বিষয়ে সচেতন বা আগ্রহী নন। অনেক অর্থনীতিবিদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। তাদের অনেকেরই মত এই যে, কার্যকর উৎপাদনব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের অনুপাত কার্যতঃ স্থির এবং পশ্চিমী প্রযুক্তি কার্যকর ও পুঁজিনিবিড়, অতএব কার্যকর প্রযুক্তিমাত্রই পুঁজিনিবিড়। এই বিশ্বাস কিন্তু যথেষ্ট তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। (আমাদের অভীপ্সিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও লক্ষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।) অনুন্নত দেশগুলিতে শ্রম ও পুঁজির পরোক্ষ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ থেকে বরং এটাই ধরে নেওয়া সঙ্গত হবে যে, কার্যকরভাবেই পুঁজি ও শ্রম পরস্পর-প্রতিস্থাপন-যোগ্য। এই সব অর্থনীতিবিদদের আরেকটি যুক্তি এই যে, পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তি গ্রহণ করলে সঞ্চয়ের হার ও সেই সঙ্গে বিনিয়োগের হারও বেড়ে যাবে, ফলে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু দেখা গেছে যে, যে সব শিল্পে পুঁজির নিবিড়তা মাঝারি ধরনের, সে সব শিল্পেই সঞ্চয়ের হার তুলনামূলকভাবে বেশী। অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের মতে পশ্চিমী প্রযুক্তির কিছু স্থানীয় অভিযোজনই অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে কোন বিকল্প প্রযুক্তি থাকতে পারে বলে তারা মনে করেন না।

অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পশ্চিমী পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার প্রমাণের জন্য বেশী তথ্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তিন-চার দশক ধরে পশ্চিমী কৌশল ব্যবহার সত্ত্বেও এ সব দেশে জনপ্রতি আয়-বৃদ্ধির হার রুদ্ধ-গতি, শিল্পায়নের হার ক্রমহ্রাসমান, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। কোনদিনই এসব দেশ পশ্চিমের সমকক্ষ হতে পারবে না। পশ্চিম এখন যে স্তরে আছে, সে স্তরে পৌঁছাতেও এদের কম করেও বেশ কয়েকশ বছর লাগবে। এই পটভূমিকায় অপেক্ষাকৃত শ্রমনিবিড় প্রযুক্তিই কাম্য। এবং তা সম্ভবও।

এখন প্রশ্ন হল এই যে, এই উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কীভাবে সম্ভব? এর জন্য সরকারী পরিকল্পনার ধাঁচের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে, গ্রাম থেকে অর্থাৎ সর্বনিম্ন স্তর থেকে পরিকল্পনার লক্ষ্য, নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। উপর থেকে সাধারণ মানুষের উপর পরিকল্পনা চাপিয়ে দিলে চলবে না। ভৌত ও সাংগঠনিক পরিকল্পনার উপর জোর দিতে হবে। 'নগ্নপদ' পরিকল্পনা-রচয়িতারা গ্রামের মানুষের পরামর্শ ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে পরিবেশ ও পরম্পরার মধ্যে সঙ্গতি রেখে গ্রাম, জেলা ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করবেন। এ কাজ না করলে শহর, শিল্প ও উচ্চতলার লোকের স্বার্থসিদ্ধির প্রতি পরিকল্পনার ঝোঁক রোখা যাবে না।

যেসব সরকারী নীতি কেবল পরজীবী এলিট সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাবার জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেগুলি পরিত্যাগ করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে, বিশেষ করে প্রযুক্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের যোগসাধন করতে হবে। আজ সাধারণ মানুষের শ্রমে সৃষ্ট সম্পদ ব্যবহার করে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণের কথা দূরে থাক্, নিখাদ জ্ঞানার্জন অথবা পশ্চিমের সফল অনুকরণ—এই দুই ক্ষেত্রেই এগুলি ব্যাপকভাবে ব্যর্থ। প্রকৃতপক্ষে বিদেশের উদ্বৃত্ত অথবা ক্ষতিকারক ও নিষিদ্ধ, অথবা সম্ভবতঃ ক্ষতিকারক ও সেই কারণে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার্য, অথবা পুরানো ও বাতিল দ্রব্যসামগ্রী ও প্রযুক্তি স্বদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং বিদেশের জন্য স্বল্পব্যয়ে দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে।

এসব কথা বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, অনুন্নত দেশগুলিতে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কোন প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা নেই। এসব দেশেই বরং জ্ঞানবিজ্ঞানের গভীরতর ও নিবিড়তর এবং অন্য ধরনের চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ:

75680

এসব দেশে পারিবেশগত সীমাবদ্ধতা সংখ্যায় ও গুরুত্বে অনেক বেশী। তাই উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও মৌলিক গবেষণা এসব দেশে অপরিহার্য। পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্ধ অনুকরণ অথবা স্থানীয় অভিযোজন এসব দেশে শুধু অবান্তরই নয়, মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। প্রকৃত বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে। প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ণয়, নীতিনির্ধারণ ও পদ্ধতিনিরূপণের। গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথার্থ মানদণ্ড নির্ধারিত হলেই তবে দেশগুলি পশ্চিমের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে পারবে। আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির (আজকের ভাষায় 'উত্তরের' শিল্পোন্নত দেশগুলির) যে সম্পর্ক রয়েছে—সকল ক্ষেত্রেই, শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নয়, তা হল নির্বোধ গ্রহীতার সঙ্গে চতুর দাতার সম্পর্ক। চতুর দাতা 'হিসাব করে পুণ্য' করছে, আর নির্বোধ গ্রহীতা বুঝতেও পারছে না যে, তার সমস্ত সম্পদ—খনিজ সম্পদ থেকে শ্রমসম্পদ পর্যন্ত সবই—লুঠ হয়ে যাচ্ছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে মূল কথা হল ঃ

(১) পশ্চিমী প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশ এবং পশ্চিমী ধাঁচের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রচণ্ড বিধ্বংসী ঔপনিবেশিক (আভ্যন্তর বা বহিঃস্থ) শোষণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয় ; শুধু মালিকানার প্রকৃতি বদলিয়ে এই প্রযুক্তির প্রকৃতি বদ্‌লানো যায় না ;

(২) সেই কারণে—অনেক আনুষঙ্গিক কারণও রয়েছে—পশ্চিমী প্রযুক্তি কোন দেশেই সুস্থ সমসমাজ গঠনের অনুকূল নয় বিশ্বজনীন সাম্যের কথা ছেড়ে দিলাম।

(৩) তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিতে এই পশ্চিমী প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির ধাঁচ ; অচল ও অনুপযোগী, কাম্যতো নয়ই ; এবং

(৪) যত দিন না তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিকল্পনা জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হবে, যত দিন না জনগণ এ বিষয়ে সচেতন হবে. যত দিন না এ ব্যাপারে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠবে, ততদিন বিকল্প প্রযুক্তির সন্ধান, বৈষয়িক বিকাশ ও সমসমাজ গঠনের পথ অবরুদ্ধ থাকবে।

পরিশেষে বলতে পারা যায় যে, যদিও বিকল্প প্রযুক্তির প্রশ্নটি মুখ্যতঃ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণের ক্ষেত্রে মরণ-বাঁচন সমস্যার সঙ্গে জড়িত, তবুও শিল্পোন্নত দেশগুলির জনগণের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটির গুরুত্ব কম নয়।

উল্লেখপঞ্জী :

পল্লীপুনর্গঠন : সংকলন—মহাত্মা গান্ধী

মার্কস্, গান্ধী এ্যাণ্ড্ সোশ্যালিজম্ : সংকলন—ডঃ রাম-মনোহর লোহিয়া (ভূমিকা ও প্রথম তিনটি রচনা)

দি ইকনমিক্ হিস্টরি অব্ হাণ্ডয়া (১ম খণ্ড) —রমেশ দত্ত (পরিচ্ছেদ ২৩)

এডুকেশান্ ইন্ দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড, সম্পাদনা—কীথ ওয়াট্‌সন্ (পরিচ্ছেদ ১০)

টেক্‌নলজি ইন্ ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন্, সম্পাদনা—ক্রান্‌ৎজবার্গ ও পার্সেল (দুই খণ্ড) (বিশেষ করে কে. ই. বোল্ডিং-এর ও জে. বারান্‌সনের প্রবন্ধ দুটি)

এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনলজি ফর্ থার্ড ওয়ার্ল্ড সম্পাদনা—এ. রবিন্‌সন্ (বিশেষ করে অমূল্যকুমার রেড্ডির ও এল্. জে. হেয়াইটের প্রবন্ধ দুটি)

তিনটি কবিতা

অভিজিৎ দত্ত

॥ এক ॥

আমরা এখন অন্ধকারে
বীজতলীতে ওড়াচ্ছি ছাই—
স্বভাবতঃই ভুগছি রোগে
এবং দেখি রাত রোশনাই
ঝিলিক দিচ্ছে অনবধানে,
তারপরেতেই আগল তুলি
রুগ্‌ণ বোধে, আজকে শুধু
কলকে ছিলিম ভরায় ঝুলি—
অথচ দ্যাখ নিখুঁত পায়ে
ট্র্যাপিজ বারে সাম্য রাখে
এবং দারুণ অন্ধকারে
চোলাই করে ব্যর্থতাকে ;
অতঃপরে পদস্খলন—
স্বখাত পাঁকে নিমজ্জমান
অহংবোধও, এখন শুধু
ভরসা রাখি নেশার যোগান ।

॥ দুই ॥

যুবকেরাও ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে ফেরারী হয়েছে আজ
রোদ নেমে গেছে
ভাঙা উঠোনেতে শালিকের মতো চটপট খই খুঁটে নিল
বাহাত্তুরে বুড়ো
পথে পথে গ্যাস
ধোঁয়া জ্বলে আগুন বারুদে
চোরা গলি খুঁজে নিতে নিতে বিকেল গড়ালো—
আজ শুধু কথা ঈষাকাতরতা দেওয়ালে পোস্টারে
শব্দ ফেটে ওঠে
পার্কের ঘাসে চোরঙ্গীর মোড়ে সিনেমায় ।
নীরবতা দূরে
স্তব্ধ হয়েছে
কে কাকে শেখায় নীতি শতাব্দী বৃদ্ধ হলে
দন্তহীন মুখে হাসি, রেলিঙেতে চোখ
চেপে দেখে দূরে গলালাভা বয়ে গিয়ে
কিরকম বিপ্লব ঘটায়—

॥ তিন ॥

পাশ জুড়ে উঠে গেছে দীঘল ল্যাম্পপোস্ট
সন্ধ্যে হলে বিষণ্ণ দু হাত পেতে
মেয়েদের নিষিদ্ধ বাসর
বিষ নীল পিঁপড়ের আনাগোনা উরু ও জঙ্ঘায় ।
দূরের আকাশও খুব উদার হবার ঝোঁকে
বিকেলের দিকে রঙের জানালা খুলে দেয়
খুলে দেয় বুক. খোলা বুক ভরে গেছে বসন্তের দাগে
এখনো মেশেনা নুন জলানি পান্তায়—
তারপর ভুল হয়ে যায়
স্বাধীন সুষমা আটত্রিশ বছরে বছরে
বিকলাঙ্গ বাচ্চা বিয়োয়
আর ঘর নেই সুঠাম সময় নেই
বিকেলের আলপথ ধরে ওরা ফিরে যেতে চেয়ে
থেমে গেছে সীমান্তের তারে ।
কার দিকে চেয়ে থাকো
বিপন্ন বালক তুমি—
সারসার যৌন পুতুলের সামনে অসহায়
তদ্বিৎ ঈক্ষণে দেখে

কাচ দিয়ে ভ্রূণহত্যা হয় ।
ভাগাভাগি শেষ হয়ে গেছে
লোভী কাক তুলে নেয় কালো চোখ
বিভাগ বললে আজ রক্ত বোঝায়
রাস্তার কংক্রীট কাচ গুঁড়ো ইঁট
এসব থাকলে রক্তও পাশাপাশি থাকে
তারপর নর্দমায় মেশে
হাট করে খোলা দোর, সুসময় হাতছানি দেয়
ইতস্ততঃ শানায় জিভ নরুণের ধারে
দেওয়ালে দেওয়ালে আর তেরঙা অথবা
লাল পোস্টারে পোস্টারে
কারা মাঝরাতে হাত বদলায়
আধুলি আর খুচরো স্বদেশ ।

বাংলার কৃষক সংগ্রামে গান

শম্পা সেন

সমাজে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন বহুদিনই উঠেছে এবং এখনও উঠছে। এ প্রসঙ্গে যারা বলেন, শিল্প চলে শিল্পেরই নিয়মে, সমাজের নিয়মে নয়—তাঁদের মতের বিরোধিতা করতেই হচ্ছে। অবগাহনযোগ্য সৌন্দর্য সৃষ্টির উপাদান হিসেবে শিল্পের জন্ম সত্য হলেও, সামাজিক বক্তব্যের প্রতিভূরূপে বা লোক-সাধারণের মঙ্গলসাধনা হেতু শিল্প সৃষ্টি সত্য এবং সার্থকতর বলেই বোধ হয়। মানুষের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে আজকের যুগ অবধি তাকালে বোঝা যায়—শিল্পী-মানুষের সৃষ্ট প্রতিটি শিল্প মাধ্যমেরই মূল লক্ষ্য সামাজিক ব্যবহার। এক কথায়, শিল্পের সঙ্গে সমাজের বা সমাজের সঙ্গে শিল্পের গাঁটছড়া বন্ধন বহুদিন থেকেই বাঁধা হয়ে গেছে।

শিল্প-ভাণ্ডারের অন্যতম রত্ন—গান। গান—সেই গান—ভিজে মাটির হৃদয় নিংড়ানো, অরণ্যানীর মর্মর থেকে উঠে আসা, ঝরণা-নদী-পাখির সুরের থেকে ছেঁকে নেওয়া সেই 'মানুষের গান।'

ধরিত্রীর হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দে, খেটেখাওয়া মানুষের নোনতা চোখের জল-ঘাম আর রক্তের দামে জন্ম নিয়েছে যে গান, তার কথা কখনো লেখা হয় নি এদেশের ইতিহাসে—শাসকদের স্বার্থে। আবহমানকাল ধরে সামাজিক জীবনযাত্রার চিত্রবাহী এই হৃদয়-মথিত অমৃতের সুর তাই প্রচারিত, বিস্তৃত আর অনুরণিত হচ্ছে মানুষেরই মুখে মুখে।

হৃদয়ের মাটিতে শিকড় গেড়ে যে শিল্পতরু জন্মেছে, সে মানুষের আত্মার আত্মীয়। দুর্যোগের দিনে স্বজন বন্ধুর মত এই শৈল্পিক আত্মাই তো হল হাতিয়ার! অত্যাচারের প্রতিবাদে, সমব্যথী স্বজনের সঙ্গে সৌহার্দ গ্রন্থনে, জনমানসে চেতনার জাগরণে—গানই হয়েছে একমাত্র সেতু। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই, বিশেষতঃ বৈদেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে জাতীয় জাগরণে ও প্রতিবাদী আন্দোলনে নেই দেশের মাতৃ-ভাষায় রচিত এবং লৌকিক সুরে বাঁধা সঙ্গীত একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেমন, বিভিন্ন কালের নানা কৃষক আন্দোলনের অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট রূপ পরিস্ফুট হয়েছে তৎকালীন গ্রাম্য ছড়ায় ও গানে।

কৃষক আন্দোলনে গানের ভূমিকা সম্বন্ধীয় আলোচনার পরিধি আজ বিস্তৃততর না করে বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে, বঙ্গদেশে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের সূচনা কবে?

আবহমানকাল ধরেই সামন্তচক্রের শোষণের শিকার হয়ে আসছে এদেশীয় দরিদ্র রায়তেরা। নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্যও কম নয়। তবে, সাধারণত কৃষক চেতনায় ব্যাপক অত্যাচার না হলে প্রতিরোধের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। অত্যাচার চরমরূপ ধারণ করলে তাদের প্রতিরোধের প্রথম অবস্থা ছিল ভিটেমাটি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া। বাংলার কৃষকদের প্রাথমিক স্তরের প্রতিবাদী মনোভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনায়। মুঘল শাসনকালে অবস্থাপন্ন কৃষক, কবি মুকুন্দকেও চরম দারিদ্র্য ও শাসকের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যের দেশত্যাগী হতে হয়েছিল। যেমন—

জানদার সভার আছে প্রজাগণ পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দিল থানা।
... ...
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডিবাটী জার গাঁ
যুক্তি কইল গভির খাঁঞের সনে।
দামিন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥

সশস্ত্র বিদ্রোহ বাংলার কৃষকদের প্রতিরোধী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘটনা। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে পূর্বভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় গোটা কুচবিহার ও আসাম সীমান্ত জুড়ে প্রায়শই কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে। এই পর্যায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ হল ১৬১৫-১৬ সনের খুন্তাঘাট বিদ্রোহ। দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয় ১৬২১ সনে; কেন্দ্রস্থল—খুন্তাঘাট। এরপর আওরঙ্গজেবের শাসনকাল থেকে তৎপরবর্তীকালে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান হল—১৬২১ খৃষ্টাব্দের কোচবিদ্রোহ এবং ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের মেদিনীপুরের কৃষক বিদ্রোহ।

মুঘল আমলে যে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের সূচনা বাংলার বুকে, তা পরিপুষ্ট হয়ে গভীরতা, ব্যাপ্তি এবং আরও উজ্জ্বল উদ্দীপনা লাভ করল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনকালে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর সন্ন্যাসীবিদ্রোহ থেকে শুরু করে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস—অত্যাচারী শাসকের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে মাতৃভূমির মাটি মাখা কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের শাণিত বীরত্বের ইতিহাস। বহু বছরের সঞ্চিত ক্ষোভ, যন্ত্রণা, নিপীড়ন আর দারিদ্র্যের প্রতিবাদে এই ইস্পাতোজ্জ্বল সংগ্রামের বাণী, মন্ত্র, চিত্র বাহিত হত ছড়ায়, গানে, কথকতায় গ্রাম থেকে গ্রামে—ময়মনসিংহ থেকে চট্টগ্রামে—চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, সুন্দরবন আরও কত দূরদূরান্তে।

ধরা যাক, ১৮৪০ সালের কথা। খুলনা জেলার অত্যাচারী নীলকর সাহেব রেনীর বিরুদ্ধে তৎকালীন তালুকদার শিবনাথের নেতৃত্বে নীলচাষীদের সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেকালের গ্রাম্য কবিতায়। এখনও এই ছড়ায় শোনা যায় শিবনাথের রণডঙ্কাধ্বনি।—

চন্দ্রদত্ত রণে মত্ত, শিব সেনাপতি।
... ...
গুলিগোলায় সাদেক মোল্লা, রেনীর দর্প করলে চুর,
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা, ধন্য বাংলা বাঙালী বহাদুর।

গত শতাব্দীর (১৮৬০ সাল) নীলবিদ্রোহ-এর দাবানল, বিস্তৃতির দিক দিয়ে অন্যতম। সোনার বাংলার শস্যভূমিতে আবির্ভূত নীলকররূপ পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সেদিন হিন্দু-মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল—তৈরী হয়েছিল নয়া ইতিহাস। গ্রাম্য মানুষের লৌকিক শিল্প বহন করেছিল সে বিদ্রোহের বীজমন্ত্র, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলে এবার ছারখার।

আবার কখনো বা,—

চাষীর শত্রু নীল কাজের শত্রু ঢিল
জাতির শত্রু পাদরি হিল্ ॥

যে গানের জন্ম নাম না জানা কৃষকের বুকে বুকে, সে গানের বাণী বহন করত বিদ্রোহী মানুষের সংগ্রামিক কর্তব্য-কৌশলের মন্ত্র তার কাঁচা সুরে—মাটির পথে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপের প্রজাদের সফল ও দৃঢ় বিদ্রোহের মন্ত্রও বাহিত হত এই পথে।—

কিয় হাইচনির বাপ্ আইলানা ক্যা কাইল বৈটহে।
আমিন ক'দিন ফিরব চহে চহে ॥
গোলায় গোলায় মাপুক্ গই যাই চিন্ দিতাম্ ন জমিনে।
বেত্রিশ সনের চিড়াদি আর কিস্ত হারে আমীনে ॥......

বাংলার জল-মাটি-হাওয়ার সন্তানদের এইসব ঐতিহ্যশালী বিদ্রোহের নেতৃত্ব উঠে এসেছিল ধূলোর বুক থেকে। বিদ্রোহী নায়কদের ব্যক্তি প্রতিভার স্বাক্ষর অঙ্কিত হয়েছিল সেকালের মানুষদের মুখে মুখে—সোনার জলে। যেমন, ১৮৭২-৭৩ এ সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহের নায়ক ঈশানচন্দ্র রায়ের গুণকীর্তন বহু গ্রাম্য কবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল।—

দৌলতপুরের কালী রায়ের বেটা।
ঈশান রায় বাবু ॥
ছোট বড় জমিদার রেখেছেন কাবু।
তাঁর নামের জোরে গগন ফাটে,
আন্ট (রাষ্ট্র) আছে জগৎময় ॥

বাংলার চাষীদের এই সংগ্রামের সঙ্গীত কিন্তু কোন সাংগঠনিক প্রচেষ্টার ফসল নয়। এগুলি ছিল নাম-না-জানা লোককবিদের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি;—স্থানীয় ভাষায় মেঠো তানে বাঁধা। বিংশ শতকে এই ধারায় ঘটল রদবদল। চিরকালীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সাথী করে সংগঠনগতভাবে শোষিত মানুষে গান রচনা করে আন্দোলন সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলল।

চল্লিশের দশক—ভারত ইতিহাসের বিক্ষুব্ধ সময়কাল। একদিকে ফ্যাসীবাদী জাপানের আক্রমণ, দেশের মুক্তিকামী মানুষের উপর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের অকথ্য নির্যাতন, অন্যদিকে—দেশীয় জমিদার-মজুতদার—মুনাফাশিকারীদের রক্ত চোষা নীতির তাণ্ডবে অসহায় বুভুক্ষু মানুষের আর্ত-চীৎকার। এরকম পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালে জন্ম লাভ করল গণনাট্য সংঘ; —সংস্কৃতি, অর্থাৎ সংস্কার দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্পের নিছক নান্দনিক উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে নয়; গণ-সংস্কৃতির মাধ্যমে খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সেতু গ্রন্থনের জন্য। জনতার জীবনের সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের কালে গণসংস্কৃতির দরিয়ায় বান ডাকল—

গণনাট্য সংঘের জমিতে ফলল সর্বাধিক ফসল। তেভাগা, কাকদ্বীপ, হাজং-এর মত স্থানীয় ছোটখাট আন্দোলনের বন্যাও গণসংস্কৃতির ভূমিকে করল উর্বরতর আর তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪২ সালে কৃষকসভা জাপানকে রুখতে যে ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলন শুরু করে, তা ব্যাপকতা লাভ করেছিল পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে। এই সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সংগীতের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। এই সময়ে গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের দুটি গান বাংলার মাঠে-ঘাটে মুখে মুখে ফিরেছিল। প্রথমটির দুটি কলি স্মরণ করিয়ে দিই—

ওরে ও চাষী ভাই
তোর সোনার ধানে বর্গী নামে, দেখরে চাহিয়া।···

এবং অন্যটি,

তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান
ও কিষাণ তোর ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান।···

বিংশের কৃষক সংগ্রামের সাগরে এক বিপুল তরঙ্গাভিঘাত এনেছিল 'ছেচল্লিশ-এর তেভাগা আন্দোলন। গণসংস্কৃতি লাভ করল সবুজ যৌবন—আন্দোলনের আঘাতে। মুকুন্দ দাসের 'ফেলে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী' বা নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট'—এর মত দেশাত্মবোধক সংগীতের দৃঢ় বলিষ্ঠতা অর্জন করেছিল এই পর্যায়ে রচিত গণনাট্যের গান। কৃষকদের মধ্যে এহসব বলিষ্ঠ সংগীত নিয়ে আসে নতুন সংগ্রামী চেতনার জোয়ার। হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা করলেন 'তেভাগার সারি' :—

তোর মরা গাঙে আইল এবার বান
নতুন দিনের নতুন কিষাণ নতুন বিধান
যায় যদি যায় যাক্‌না রে প্রাণ,
দিবনা তো ধান রে॥·····

লোকায়ত ধারাতেই এরপর হাজং বিদ্রোহের চিত্র অঙ্কিত হলো ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিতের গানে—জীবনধর্মী জারির সুরে।—

একবার মনি আচম্বিত
দেখে সুমং বাজ বাড়িতে
হাজং বহুলোক, জঙ্গী চেহারা তাদের
ভয়-ভীত মুখ, কারণ জানিতে হইল উন্মুখ।·····

এই সাঙ্গীতিক ধারার গতিপথে সলিল চৌধুরী এলেন—সুরবাণীতে জ্বলন্ত প্রতিবাদী ভাষা নিয়ে—"হেই সামাল হো, আর দেবোনা রক্তে বোনা ধান, মোদের প্রাণ হো।"·····

এইভাবে অনেক দশক এলো—গেল। হঠাৎ ষাটের দশক-এর শেষ দিকে নক্‌শাল বাড়ীর কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ঘটে গেল এক উত্তাল ঘটনা। আন্দোলনের বুকের থেকে জন্ম নিল গান—আর গানের হৃদয় থেকে ছড়িয়ে পড়ল সংগ্রামী মন্ত্র। ভুলে যাওয়া তেভাগা. হাজং-এর ঐতিহ্যকে আবার স্মরণ করা গেল, বহু মানুষের প্রাণস্পন্দনের উৎস থেকে জন্ম লাভ করা সাংস্কৃতিক স্রোতের মাধ্যমে। নক্‌শালবাড়ীর রাজনৈতিক ব্যর্থতার মাপকাঠিতে তার সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন করাটা ভুল। এই আন্দোলনেব জোয়ারে আসা সংগীত নিপীড়িত মেহনতি মানুষের প্রাণের কথাই বলেছিল। অতি সহজ ভাষায় সাদা-সিধে ভঙ্গীতে গ্রাম্য চিরায়ত সুরে বাঁধা গানগুলির কথা ভোলা যায় না কখনোই। যেমন, ধরা যাক সেই সাঁওতালি সুরারোপিত গানটির কথা—যার সুর আর বাণীর রেশ আজও চেতনায় আঘাত হানে।—

মোর জান প্রাণ ঐ লাল ধান আহা রে
তোল ভাই সব লক্ষ হাতে খামারে···
····· ····· ····· ·····
ফলাই সোনা মাটির বুকে
সইব না সইব না—ভুখেতে দিন গোনা
দেবনা দেবনা এই মাটি এই সোনা
শেষ লড়াই লড়ব মোরা ফিরব না রে।

মাটির অন্তরঙ্গতার সঙ্গে একাত্ম এইসব গান জীবনের দামে জন্ম নিয়ে মাটির মানুষের জীবনকে আলোড়িত করেছিল নতুন স্পন্দনে। এমনকি এই সময়ে মেহনতি আদিবাসীর রাজনৈতিক চেতনাস্পন্দিত গানের তরঙ্গধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল কলকাতা নগরেও, 'তীর' নাটকের মাধ্যমে।—

সর্‌ সর্‌ হাওয়া আয়ী
লালঝাণ্ডা উড়ী ফর্‌ ফর্‌ কী
লড়াই কে ময়দান
আজ চলা কিষাণ চলা মজুর···

ঊনসত্তরে গোপীবল্লভপুরে কৃষক সংগ্রামের আগুন থেকে তৈরী হয়েছিল একটি অনবদ্য সঙ্গীত—সাঁওতাল লোকসাঙ্গীতিক আঙ্গিকের ছাঁচে গড়া। সংগ্রামী সাঁওতাল দম্পতি লোকচাঁদ ও টুডুর বন্দীদশায় লিখিত এই প্রাণবন্ত গানের আবেদন ছিল অসাধারণ।

হুডুর বিজলী মালকা কাণা
দা-আই কাওতে
দিসম্‌ হরকর চমকা কানা
লড়াই আই কাওতে···

এইভাবে কৃষক আন্দোলনের রথের তোরণে যুগ যুগান্তর

ধরে উড়েছে বিজয়ী বীরদের সঙ্গীতের পতাকা। বলা বাহুল্য, গত দশকের জনপ্রিয় গণ সঙ্গীতগুলিরও কাঠামো ছিল লোকসঙ্গীতের রূপরীতিতে গড়া।

কিন্তু আজকের স্থিতাবস্থায় গান কোথায়? কোথায় হারিয়ে গেল সেই রক্তে দোলা দেওয়া জীবন ধর্মীতার চেনা সুর?

চেনা সুরটিকে খুঁজে পাওয়ার পথ বোধহয় সেই মাও-য়ের কথাটিতে লুকিয়ে আছে।—ফর্ম হল আর্ট, কনটেন্ট হল পলিটিক্স্; এই পলিটিক্স্ই জীবনের অভিজ্ঞতা—এতে প্রতিফলিত হয় মেহনতি মানুষের নিজের কথা। তাই একমাত্র আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের চূড়াই সঙ্গীত শিল্পের বাহন —স্থিতাবস্থায় এ গান থাকে ঘুমিয়ে: অনুরণিত হয়না সেই উদ্দীপক প্রাণের সুর—

হুডুর বিজলী মালকা কানা
দা-আই কাওতে,
দিস্‌ম্‌ হর্‌কর চমকা কানা
লড়াই আই কাওতে.....

শুভবুদ্ধি সংক্রান্ত আর যা কিছু

অপূর্ব সাহা

কোথা থেকে একটা শব্দধ্বনি নিখিলেশের শরীরে বেজে ওঠে। একটা সুর—কোনো কথা নেই—শুধু দেবদূতের মতো অলৌকিকতায় সমস্ত পেশীর ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। তন্তুজালে মাকড়সা পোকারা তাদের বসতি স্থাপনে আগ্রহী। তুমি নিজেকে নিজের মতো ভাবো, নিখিলেশ? স্নায়ুতন্ত্র যেন সেতারের তারে বাঁধা। তবু অচেনা আলোক—নিজেকে নিজের মত ভাবা নেই। হয়তো বা ইদানীং এ বিশ্বাস অতীব গাঢ়তর—অন্ততঃ নিখিলেশ যা ভাবে। আর তাই ছাই ছাই রঙের কুর্তাটার নীচে ধুক্‌ধুকিটার ঘুম নেই। দিনরাত সতর্ক প্রহরীর মতো সজাগ করে; সচেতন করে তোলে। সুতরাং ঘুম নেই চোখে। নিদ্রাদেবী পরীরাজ্যে অশরীরী জাদুকরী যেন; মন্ত্রমুগ্ধে নিদ্রাহীন রাখে। নিখিলেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকে। মাতালের মত সরল, অবুঝ হয়। বুকের ভেতরে শব্দ হয়। দারুন জোরে অরণ্যের দামামা বাজায় কেউ—বলে, এসো—এসো—নিশির মত ডাকে দিনরাত। এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কেউ স্থির থাকতে পারে না বলে নিখিলেশের মনে হয়। আবহমানকালের ওপর ত্রিকালজ্ঞের মত বসে ওর ইচ্ছে হয়—ইচ্ছে হয়—ভালবাসি। ছেলেবেলায় একটা আমগাছের ডালে বাঁধা দোলনাটা ছিল ক্রীড়াস্থল। সবুজ পাতার মতো কয়েকজন শিশু খেলত। সম্প্রতি নিখিলেশ আত্মানুসন্ধানে স্মৃতির জানালা খোলে হাট করে। সেই পথে হাওয়া বয়। চনমনে রোদের স্বাদে সাময়িক তৃপ্তিসাধন তার। তারপর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত অসুস্থতায়; একজন নীলচে মানুষ ক্রমশঃ আফিম-গ্রস্থ বদ্ধ জাতকের মত।

সারাদিন বিছানায় নিজেকে উলটপালট করেও ঘুম নেই। মাছের চোখের মতো স্থির দৃষ্টিতে শমিতা লক্ষ্য করে। সব সময় যে দূরে দূরে থাকে তাও নয়। তবু কি একটা যেন দূরত্ব তৈরী হয়েছে স্বাভাবিক দ্বৈত জীবনযাপনে। নিখিলেশ বিছানার ওপর বসে। মেরুদণ্ড সোজা করে নয়। একটু বাঁকিয়ে আধশোয়া হয়ে বিলাসীর মতো। রাত শেষ হয়ে ভোর হল। ভোরের আকাশ দেখা যায় জানালা দিয়ে। কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। প্রেমিকার হাতে প্রথম হাত রাখার মত স্নিগ্ধ অনুভূতি। নিখিলেশের দাঁত মাজা নেই। লালারসে ওর সারামুখ জারিত। কণ্টকর নিঃসন্দেহে; কিন্তু রাত ভাঙার পর শয্যাত্যাগে অনীহায় নিখিলেশ নিজেকে সুস্থ মনে করে। সুস্থ ও নীরোগ দেহের জন্য আমাদের ২০০০ সাল অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর দিকে যাত্রা শুরু হল।

* * *

চোখ দুটো কেমন নেশাচ্ছন্ন ব্যথা-ব্যথা করে। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর অনিদ্রাজনিত শ্রান্তির মত নিখিলেশের দুচোখ অবশ হয় ক্রমশ। কিন্তু মানসিক ভার অথবা অন্যান্য যে কারণেই হোক এসময়ে নিখিলেশের হৃদয়েও ঘুম নেই। এবম্বিধতায় বিছানায় নিজেকে ক্রীড়াসঙ্গী বানাতে ইচ্ছে হয়। নিখিলেশ একটা চোখের খেলা খেলে। দৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রন জনিত ক্রীড়ায় ক্রমশ সে তার ক্ষণিক বিস্মৃতির পরিধি বাড়িয়ে দেয়। ডান চোখ বন্ধ করে বা চোখ দিয়ে তাকায়। দৃষ্ট হয় তিনটে পিলারের ওপর সটান দেয়াল। মাঝে মধ্যে পলেস্তরা ঘসে আছে। এখন ফ্যাকাশে। বোঝা যায় এককালে ঘন নীল রঙ ছিল তার। আভিজাত্যের প্রতীকী উপমা নীলরঙে এখন বহুধা বর্ণের সমাবেশ। মাঝে মাঝে ঝুল জমে আছে কালো হয়ে। দেয়ালে ঝোলানো অতি জীর্ণ দু একটা ঠাকুর দেবতার ফটো। সর্বশেষ বিশ্বাস এবং নির্ভরতার উৎস হিসাবে এখনো রয়েছে। আর একটা পারিবারিক গ্রুপ ফটো। সেখানে পূর্বপুরুষ এবং মহিলাদের আনুপূর্বিক অবস্থান। বর্তমানে সকলেই মৃত। সান্নিধ্যলাভের কোন সুযোগ নেই সেখানে। যদিও পারলোক চর্চার পরিবর্তে সুখস্মৃতি রোমন্থনে অধিক উৎসাহ বোধ করে নিখিলেশ।

বাঁ চোখ বুজিয়ে ফেলে ডান চোখের পাতা মেলে যায় নিশি-

পদের্র মতো। পাপড়ির মত অনুভূতিপ্রবণ এই চোখের নিখিলেশের রক্তদর্শন হয়। লাল রঙ—লাল রক্ত। যক্ষ্মা রোগীর শ্লেষ্মার সাথে উঠে আসা তাজা রুধিরের মতো। সমস্ত দেয়াল জুড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামে। নিখিলেশ নিরাপত্তা-হীনতায় বোবা হয়ে যায়। হঠাৎই সমস্ত ফ্রেম জুড়ে জমাট বাঁধা নিকষ কালো অন্ধকার। শুধু সেই স্মৃতিচিহ্নের জায়গায় একটা আবছা নীল আলো—ধ্রুবতারার মতো স্বস্তিদান করে।

নিজের দায়ত্ব এখন অপর কারুর ওপর ন্যস্ত হলে নিখিলেশ বোধহয় খুশী হবে। কারণ একই সঙ্গে ভয় এবং অস্বস্তি ছিনে জোকের মত তার সারা শরীর বেয়ে উঠছে। চোখদুটো নষ্ট হয়ে যাবে নাতো? তবু ইচ্ছের শেষ নেই। নিখিলেশ এ এক মজার খেলায় নিজেকে সমর্পণ করে। বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখ খোলে, আবার ডান চোখ বুজে বাঁ চোখে তাকায় বারেবার। দু চোখ একসঙ্গে খুললে সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সাদা আলোর বন্যা। চোখ ধাঁধিয়ে যায় সেই প্রখর সূর্যালোকে। দুচোখ বুজলে চোখজুড়ে নামে অন্ধকার মিশেল কালো পর্দা। নিখিলেশ ভীষণ অসহায় বোধ করে সেসময়। মনে হয় যেন কোন খাদ থেকে পা হড়কে নীচে নেমে যাচ্ছে। দমবন্ধ হয়ে আসে।

* * *

শমিতার চাঁপাফুলের মতো দুই হাত। আঘ্রাণে সমস্ত ভয় ভাবনা দূরীভূত হয়। নিখিলেশ আগ্রহী হয় সেই স্পর্শ লাভে এবং তৎকালীন স্বাভাবিক গন্ধলাভে। তৎপর হতেই শমিতা অবাক হয়। তারপর মৃদু ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে বলে—যাঃ, কি ছেলেমানুষ হচ্ছো দিন দিন। নিখিলেশ আবার নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অথচ শমিতার প্রতিটি শরীর তার চেনা। অত্যন্ত কাছের বন্ধুর মতো। সুতরাং একটা নির্বিরোধী ব্যবধানের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। নিখিলেশ জানে শমিতার দু হাতের মুঠোয় মমতা মায়ের আঘ্রাণ আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু সে বিষয়ে সমস্তরকম সক্রিয়তাই শমিতার কাছে নিতান্ত অর্থহীন এক ছেলেখেলা। সমুদ্রে নিখিলেশ নিজের ঘরটাকে তুলে নিয়ে বসাবে। সেখানে জীবন যাপন করবে একা।

একা একা সেই পুরোনো রাস্তা দিয়ে ধীরপায়ে হেটে যেতে নিখিলেশের মনে ঝুমঝুম শব্দে নূপুরধ্বনি বেজে যায়। একটা একতারার সুর বাজে। বৈরাগ্যের সুর: অসীমতার ব্যঞ্জনা। এ রাস্তা দিয়ে ছেলেবেলায় নিখিলেশ স্কুলে যেত। এখনও রাস্তাটুকুই আছে। আশপাশের বাড়ী বড় হচ্ছে। কিন্তু রাস্তাটা সেই আগের মতো। নানারঙের পাথর দিয়ে তৈরী। কোনটা সাদা, কোনটা লাল, কোনটা খয়েরী আবার কোনটা কালো। নিখিলেশ একটা পাথর কুড়িয়ে নেয়। শ্বেতপাথরের মতো সাদা রঙ তার। সাদা রঙে সব রঙই লুকিয়ে আছে, তাই নিখিলেশের প্রিয় রঙ শ্বেত। হদানীং সারাক্ষণ ও সেই পাথরটাকে নিজের কাছে রাখে। যেন ওর মধ্যে রূপকথা রাজ্যের রাজপুত্রের প্রাণ লুকিয়ে আছে, পাথরটা সাথে রাখলে ও ছেলেবেলায় মা-কে জড়িয়ে ঘুমোবার মত স্বপ্ন দেখতে পায়।

একদিন নিখিলেশ বিছানায় নিঃসঙ্গ শায়িত। একটা দুটো, তিনটে কিম্বা চারটে অথবা পাচটা পাহাড় এলোমেলো-ভাবে দাঁড়িয়ে। প্রতিটি পাহাড়ের চূড়ায় পারিবারিক গ্রুপ ফটোর মধ্যেকার পূর্বপুরুষ এবং মহিলারা অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে দাঁড়িয়ে। নিখিলেশ পাহাড়গুলোর মধ্যেখানে নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করে। এক চূড়ান্ত আবেগ ও উত্তেজনায় ওর গতিময় হবার বাসনা জাগে। হঠাৎই সমস্ত পাহাড়গুলো চলতে শুরু করে। যেন চাকা লাগানো ছিল প্রত্যেকের নীচে। নিখিলেশ তার মধ্যে আটক হয়, ওর দমবন্ধ হয়ে আসে। পাহাড়ী উপত্যকায় কোথাও ছুটে বেরোবার পথ নেই, নিখিলেশ ছুটতে যায়। হোচট খেয়ে পড়ে। আবার দৌড়োয়: পালাও পালাও, নিখিলেশ—ফিস্‌ফিস্‌ স্বরে কেউ বলে। বিছানায় নিখিলেশের শরীর ক্রমশঃ কুঁকড়ে যায়।

* *

এভাবে দিন শেষ হয়, রাত কাটে। এ নিয়মের হেরফের হবার যো নেই। নিখিলের জীবনযাপনের মতই গতানুগতিক। সেই প্রিয় রাস্তা ধরে নিখিলেশ আজো হাটে।

* *

আজ আকাশটা নানান রঙে রঙিয়েছে নিজেকে। কিসের এত আনন্দ ওর! শিশুব্যবহৃত রঙীন প্যালেটের মতো উজ্জল রঙগুলো দূরের সবুজ গাছের মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। একটা সোনালী রঙের আলো শেষ বিকেলকে মায়াময় করে তুলেছে। নিখিলেশ এসব লক্ষ্য করেই হাঁটে। রাস্তায় শিশুরা খেলছিল। ওদের মধ্যে বাল্যবন্ধু হারানের উপস্থিতি তার নজর এড়াল না। শারীরগত দিক থেকে বয়সোচিত না হলেও আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, বেমানান নয় মোটেই। ওরা একটা অদ্ভুত খেলা খেলছে। এক হাবান বাদে প্রত্যেকের চোখ বাঁধা। ওরা সকলেই হাবানকে ছুঁতে চায়। কিন্তু সে অত্যন্ত সুকৌশলে নিজেকে বাচিয়ে চলেছে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ হারানকেই শুধু ছো! কানামাছি ভোঁ-ভোঁ—ওরা হাতড়ে বেড়ায়। নিখিলেশ ওদের খেলাধুলোর পাশে দাড়িয়ে পড়ে। হারানকে ও ঠিক চিনেছে। কিন্তু হারানের ব্যবহার অপরিচিতের মতো। যেন চেনেই না; হাতপুবে কোন দিন দেখেনি তাকে। শিশুরা খেলতে খেলতে দূরে সরে গেছে। নিখিলেশ কাছে এগিয়ে যায়। হারান ডুগডুগি বাজায়, কখনো সুর করে কাদে, আবার কখনো বা একমনে বিড় বিড় স্বরে উচ্চারণ করে—আমি মরে যাব, আমি ঠিক মরে যাব। একথা কারুরই অজানা নয় যে প্রতিটি মানুষ মরণশীল। কিন্তু ঠিক এমন-

ভাবে কেউ ভাবিত হয় না। অন্তঃত নিখিলেশ এর আগে কাউকে দেখেনি। ফলত হারান ওকে আকর্ষণ করে। হারানের অস্বাভাবিকতাই নিখিলেশকে সচকিত করে। হারানের শরীরময় মাতৃকার আবরণ, রুক্ষ চুল, সবুজ হয়ে যাওয়া দাঁত নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের মতো ধরা দেয় নিখিলেশের কাছে। ও বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে যে তাদের উভয়কার জীবনযাপনীয় চৌম্বকমেরু বিপরীত। তাই কাছে টানে। উভয়কার আকর্ষণ দৃঢ়তর করবার পক্ষে নিখিলেশের দিক থেকে কোন বাধা থাকে না। ও একপ্রকার জোর করেই হারানকে ওর বাড়ীতে নিয়ে আসে। গার্হস্থের সংসারজীবনে এই প্রথম একজন সর্বজন-স্বীকৃত তথাকথিত পাগলের আবির্ভাব ঘটল।

শমিতা ভীষণ ভীত হয়। প্রসাধনের খরচ দিন দিন বেড়ে চলে। হারান অযাচিতের মতো তার দিকে চেয়ে হাসে। এ হাসি কি করুণার? ক্ষমার্হ দৃষ্টি নাকি হারানের? নিখিলেশ বোঝে, তার এবং হারানের মধ্যেকার অনুক্ত বেদনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্য দুজনের একসাথে বাস করা কর্তব্য। কারণ এ পথেই হয়তো সমাধান বেরিয়ে আসবে। আর এহেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে শমিতারও খানিকটা চিন্তাভাবনা সহ সাহায্য প্রয়োজন। নিখিলেশের মনে এখন আর অকারণ ঝড় বাদলের উপদ্রব নেই। সব শান্ত হয়ে আসছে। ও হারানকে স্নান করায়, খাওয়ায়। পোশাক পরানোর ব্যাপারে হারানকে কিছুতেই রাজী করান যায় না। নিখিলেশ একাপ্রকার জোর করেই ওকে পোশাক পরায়। এ প্রকারে হয়তো নিজের অজ্ঞাত-সারেই নিখিলেশ এক অভ্যস্ত জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে যায়। হারানকেও তার সাথে টেনে নিতে চায়। হারানের সুখ, হারানের অ-সুখ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা একটা ব্যাকরণের জালে জড়িয়ে পড়ে ডানা ঝাপটায়। হারান দিন দিন অসমর্থ হয়ে পড়ে, ওর শারীরিক প্রতিরোধ কমে আসে। চুপচাপ একটা ঘরে শুয়ে থাকে, কেউ কাছে গেলে ব্যথিত অসহায়ের মত চায়।

কখনো দু-হাত দিয়ে সারাদেহ চুলকোয়। শরীর থেকে রক্ত বের করে ফেলে। ইদানীং ওর দেহে কিছু অদ্ভুত চাকা চাকা দাগ দেখা গেছে। কিন্তু হারান ঘর অন্ধকার করে বসে থাকে। কাউকে কাছে আসতে দেয় না। বিকৃত বীভৎস মুখ করে বনমানুষের মতো আঁচড়ে কামড়ে নিজেকেই রক্তাক্ত করে। একসময় ক্লান্ত হয়ে বিছানার ওপর ভাঙচুর হয়ে পড়ে থাকে। নিখিলেশ এসব লক্ষ্য করে, আর লক্ষ্য করেই তার ভীষণ উৎকণ্ঠা হয়। অভিমানী রমণীর কাছে পৌঁছোবার জন্য উৎকণ্ঠার মতো নয়—এ উৎকণ্ঠা বুকের ভেতর। নিজের হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখবার উপায় সম্পর্কিত উৎকণ্ঠা নিখিলেশকে ভাবিত করে।

নিখিলেশ হারানকে নিয়ে ডাঃ সেনের চেম্বারে যায়। তিনি ওদের অপেক্ষা করতে বলে সামনের চেয়ারে বসতে বলেন। ভদ্রলোক ভীষণ শৌখিন। সেহেতু বিভিন্নপ্রকার ছবি টাঙানো রয়েছে তাঁর ঘরে। দেখতে দেখতে নিখিলেশের সময় কেটে যায় বেশ। কিন্তু হারান আবার অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে দেয়। শান্তা হিজরের মতো মাজা দুলিয়ে হাত তালি দিয়ে একটা অদ্ভুত সুরে ও বলে—কিছুই হবে নাগো বাবু—না ছেলে, না মেয়ে—আমি ঠিক মরে যাব—দেখো, আমি ঠিক..... বলতে বলতে হারান উত্তেজিত হয়। ওকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ও হঠাৎই ডাঃ সেনের চেম্বারে সুদৃশ্য ম্যাডোনার ছবিটা নামিয়ে ফেলে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় নিখিলেশ যারপরনাই লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হয়। ডাঃ সেনের কাছে উপযুক্ত ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্বক সে বাড়ী ফিরে আসে।

* * *

বাড়ি ফিরে তার চোখে হারানের সুখ দেখা যায়। হারান পোশাকবিহীন শরীরে ম্যাডোনার ছবিটা বুকে চেপে ধরে শুয়ে আছে। মনে যেন প্রিয়জনের স্পর্শসুখ অনুভূত হচ্ছে। সেই সুখে কোন যন্ত্রণাবোধ নেই। বরং একটা প্রশান্তি এসেছে। নির্মল আনন্দে হারানের চোখমুখ আবার আগের মত স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। নিখিলেশ প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তারপর সমস্ত কিছু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। আরোগ্যলাভের নবতর উপায় উদ্ভাবনে তার ভেতরে উচ্ছ্বসিত জলোচ্ছ্বাস। সে হারানের কপালে প্রিয়জনের মতো হাত বুলোয়। আবেগে তার গলা বুজে আসে।

নিখিলেশ দেয়াল থেকে পারিবারিক গ্রুপ ফটোটা নামায়। ম্যাডোনার ছবিটা আঠা দিয়ে হারানের গায়ে সেটে দেয়। ফটোটার মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রিয়জনের মুখ কাঁচি দিয়ে গোল গোল করে কাটে: তারপর সেগুলো হারানের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লাগিয়ে দেয়। হারান সারছে ..... ক্রমশ সুস্থ হবার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। নিখিলেশ ছবি আকার সরঞ্জাম গুছিয়ে বসে। কাগজ কাটে। পোস্টার তৈরি করে। একবিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী মূল্যবোধের বিপরীত চিন্তাভাবনার স্বপক্ষে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্ট হয় নিখিলেশের রঙ তুলির কারুকাজে। নিখিলেশ অদম্য আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষায় শুভবুদ্ধি, মানবিকতা, সারল্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজ হারানের শরীরে পোস্টারের মত মেরে দেয়, কোনটা বা হারানের গলায় ঝুলিয়ে দেয়। শমিতা উঁকিঝুঁকি দিয়ে অবাক চোখে এসব লক্ষ্য করে। হারান শিশুর মত অবুঝ হাসি হাসে তার দিকে চেয়ে।

হারান আজ ভীষণ চঞ্চল উচ্ছ্বল হয়ে উঠেছে। এটা ধরে ওটা ছোঁয় কাঠবেড়ালীর মতো। তারপর এক সময় খোলা দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। কলকাতা শহরে শহরতলীর মানুষের ভিড়। কয়েকদিন আগেই প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও কোন কোন জায়গায় জল জমে আছে। প্রত্যেকে গোড়ালী উঁচু করে নিজেকে বাঁচিয়ে পথ হাঁটে। শুধু হারান বেপরোয়া এগিয়ে যায়, সকলে অবাক চোখে ওর দিকে তাকায়।

ওর কিম্ভূতকিমাকার শরীরের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে। নিখিলেশ এগিয়ে যায় ওকে ধরবার জন্য, কিন্তু পারেনা। হারান ছুটতে আরম্ভ করে।

কলকাতা শহর খোঁড়াখুঁড়ি হয়। পাতাল রেলের কাজ এগিয়ে চলে ক্ষমতার ব্যবহার অনুসারে। লোহালক্কর খোঁড়াখুড়ির মধ্যে জল জমে গেছে কয়েক দিনের বৃষ্টিতে। হারান ছুটতে ছুটতে সেই জলের মধ্যে এসে পড়ে। পাতাল রেলের জলভর্তি গর্তের মধ্যে পড়ে হারান ট্যাংরা মাছের মতো খলবল করতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় নিখিলেশ যেন বোবা হয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মাঝখানে ওর বুকে একটা প্রবল যন্ত্রণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ও বুঝতে পারে হারানকে রক্ষা করা ওর কর্তব্য। সেহেতু নিখিলেশের আকুলতা বৃদ্ধি পায়, ও হারানকে লক্ষ্য করে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেবেলাকার সেই পাথরটা ছুড়ে মারে। চিৎকার করে বলে—হারান তুই উঠে আয়—আমি সাঁতার জানি না রে—। সে চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। হারান ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে থাকে। জল লেগে আঠা আলগা হয়ে হারানের গায়ের ছবি এবং পোষ্টারগুলো খুলে যেতে থাকে। কাদা লেপ্টে নষ্ট হয়ে যায়। হারান যন্ত্রণায় ডুবে যেতে থাকে। নিখিলেশের বুকের ভেতরটা কেমন জমাট বাঁধতে থাকে। প্রবল বর্ষণের আগে নিথর মেঘের মতো। তারপর ও ভীষণভাবে কাঁদতে থাকে। ওর দুচোখ বেয়ে নোনা জলের ধারা অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ে। উবু হয়ে ও পাতালরেলের গর্তে ঝুঁকে পড়ে। প্রচণ্ড আবেগে ওর সারা শরীর থরথর করে কাপতে থাকে। গড়ে ওঠা আগামী দিনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ওর চোখের সামনে তলিয়ে যায়। উত্তেজনায় ও মাটিতে মুখ ঘষতে থাকে। ধুলো এবং কাদা লেপ্টে যায় ওর সারা শরীরে। ··· নিখিলেশের মনে হয় হারানের সঙ্গেই পাথরটার সব প্রেম, নিজস্ব চেতনা আর শুভবুদ্ধি সংক্রান্ত আর যা কিছু সমস্ত ডুবে গেছে, ওর পাথরটাও ডুবে গেছে, এসব কথা চিন্তা করে নিখিলেশের কান্নার জোর এবং বেগ ডবলই বেড়ে যায়।

এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সেসময় নিখিলেশের চারধারে জড়ো হয়ে থাকা লোকগুলো দাত বের করে হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে ওকে চূড়ান্ত ব্যঙ্গ করে।

তিনটি কবিতা

সৌম্য দাশগুপ্ত

ছোটমাসি বুড়ি হয়ে গেছে

যেখানে থামার কথা ছিল—বহুলগ্ন কথা হলে,
সেখানে নিঃশব্দ হতে
হঠাৎ ভুলেছো ইদানীং

বেলপাতা ঘটের জলে, আলতায় নক্‌শা মানুষের,
কাঁথার আসন বড়ো পারপাটি।
ঘরের চুড়োয়

শীতের শৌখিন উষ্ণ সাজগুলি ঝুলিয়ে রেখেছো ;
তোমার ঘরেই

হঠাৎ প্রবেশে খুব ছেলেবেলাকার গন্ধ পাই।
আঁচলে চাবি কি তুমি নতুন ধরেছো,
নাকি তা-ও

পরম্পরাধর্ম জেনে বহুদিন আশ্রয় নিয়েছে !

কুলুঙ্গির ভাঙা হাট, শিকলে ঝুলছে মরচে খুব—
তোমার অবস্থা আজ বস্তুত তেমন মনে হয়।
তোমাকে অনেকদিন পর এই ঝঞ্ঝার খেয়ালে
দেখা গেল, ছোটমাসি,

তুমি খুব বুড়ি হয়ে গেছ !

ছেলেটা

কপালে ছিল জড়ুল চিহ্ন
ছিলার মতন সটান, শক্ত
ছেলেটা নয় আদৌ ভিন্ন
গোত্রের, শুধু নেশায় ধুঁকতো।

ঘুন্‌সি ছিল কোমর জুড়ে
ঝুলছিল তার, তাবিজ, সুতো,
ছেলেটা পথ অনেক ঘুরে
মধ্যরাত্রে দাওয়ায় শুতো।

ঘরবাড়ি, গ্রাম দেশ ছিল না,
হয়তো কিছু পরিত্যক্ত
ধুলোর মতন উড়েই এসছে,
পোশাক-আশাক অবিন্যস্ত।

কাল আসেনি, আজ এল না,
চাটাই, গামছা শুকনো ঝুলছে
আজ আমি তার ধড় দেখেছি
মুদেফিরাস দ্বিধায় খুলছে।

ঘরবাড়ি, গ্রাম দেশ ছিলনা
কোনরে বাঁধা পাথর, সুতো
ছেলেটা পথ অনেক ঘুরে
শ্রান্ত দেহে দাওয়ায় শুতো।

এইসব চপল দৃশ্যাবলী

'প্রগতি' কথাটা লিখলেই লাল রঙের জবা এসে পড়বে গায়ে
পায়ের কাছে ছ'ড়ে দেবে কেউ ধুলোর মতন নিস্পৃহতা

নিঃশ্বাসে আটকে আছে হাল্‌কা আগুন,
'আগুন' শব্দটা লিখলে কাঁপুনি দেয় শরীর

অর্ধেক মাটির জন্য সমস্ত প্রজন্মগুলি মাথা খুঁড়ছে
আর বনভোজনের মতন সমারোহ উঠে এল আমারই এই উঠোনে !

—এইসব চপল দৃশ্যাবলী ঝিকিয়ে উঠছে লাঙলের ফলার মতন,
ধানজমি দখল হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম।

এইসব ঘোরতর শব্দগুচ্ছময় গণ্ডগোল ছেড়ে, এসো,
কন্‌কনে শীতের এই সন্ধ্যায় আমরা জানলা খুলে দিই উত্তরের :

দেখ,
এইরকম অদ্ভুত সময়েও নদীর ওপার থেকে
আদিবাসীর দল ঠিক একইরকমভাবে কেমন একজোড়া
হরিণ মেরে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে !

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজনীতি

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বর্তমানে যে দলীয় রাজনীতির দাবাখেলা চলছে তাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজ। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পালা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহকেরা ধর্মঘট ডেকে চলেছে। শিক্ষক, অশিক্ষক বা ছাত্র—কেউ বাদ যাচ্ছে না, এই রাজনৈতিক খেলায় যোগ দিতে। আর আপাত দৃষ্টিতে যাঁকে কেন্দ্র করে এত গোলমাল ও অসন্তোষ সেই উপাচার্য নির্বিচারে তাঁর বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করে চলেছেন একের পর এক। সেনেট, সিণ্ডিকেটের রাজনৈতিক দাদাদের অনুমোদন ছাড়া তাঁর এই স্পর্ধিত আচরণ অতি সহজেই 'স্বৈরাচারী' এবং 'কেন্দ্র নির্দেশিত' আখ্যা পেয়ে গেছে। সহজভাবে গোটা ব্যাপারটায় আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হল, শিক্ষায় গণতন্ত্রের নামে বর্তমান সরকার দলের লোকদের দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন চালাতে চাইছেন। আর তার প্রতিপদেই বাদ সাধছেন উপাচার্যমশাই।

বর্তমানের অচলাবস্থার সূচনা পাঁচজন কর্মীর বরখাস্ত হওয়ার ঘটনা থেকে। ক্রমে তা বিভিন্ন কারণের সমাহারে জটিলতর হয়ে উঠেছে। রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে উপাচার্যের মন কষাকষি, একজন ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের নিয়োগের ক্ষেত্রে উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ; আর একজন ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের উপাচার্য বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে যোগদান—এই তিন ঘটনায় প্রশাসন প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার নিয়োগের ক্ষেত্রে উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ আটকানোর জন্য মামলা করা হয়েছে। এমনকি, সহ-উপাচার্য (অর্থ) এর নিয়োগও রাজনীতি বহির্ভূত কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়নি। উপাচার্যের একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতায় বিপর্যস্ত হয়ে বর্তমান সরকার নিজেদের বানানো আইন সংশোধন করার কথা ভাবতে শুরু করেন। এর ফলে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আচার্যের ক্ষমতা কমবে এবং সেনেট ও সিণ্ডিকেটের উপর সেই চরম ক্ষমতা আপতিত হবে। অর্থাৎ এই সংশোধিত আইন অনুসারে সিণ্ডিকেটে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত তিনটি নামের একটি প্যানেল থেকে সেনেট একজনকে নির্বাচিত করে সেই নাম আচার্যকে পাঠাবে। আচার্য বাধ্য থাকবেন এই নির্বাচিত ব্যক্তিকে উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত করতে। অন্যদিকে উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতার ৯ (৬) ধারার প্রয়োগ বাতিল না করে তার আংশিক পরিবর্তন করতে চেয়েছেন বর্তমান সরকার। সিণ্ডিকেটের সঙ্গে উপাচার্যের মতান্তর হলে সেক্ষেত্রে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

এরই মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করার জন্য কংগ্রেসী এবং নিরপেক্ষ কিছু শিক্ষাবিদ্ উঠে পড়ে লেগেছেন। ভাবটা এই, কেন্দ্র অধিগ্রহণ করলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সমস্যার সমাধান।

যা হোক, সব মিলিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন লেবু-কচলানো রাজনীতি চলছে। পশ্চিমবাংলা কিংবা ভারতের নয়, সমগ্র এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে প্রত্যেকদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মাইক লাগিয়ে, ম্যারাপ খাটিয়ে উৎসবের মেজাজে আন্দোলন হচ্ছে। বেশ রসে বশে আছে সবাই—শিক্ষক, অশিক্ষক এবং ছাত্রদরদী (?) সংগঠনগুলো। কিন্তু যাদের কথা বলবার বা শোনবার কেউ নেই তারা হল অগুনতি ছাত্রছাত্রী, যাদের এ জন্মের পাপকর্মের ফলে পড়তে হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরীক্ষার ঠিক নেই, খাতা দেখার ঠিক নেই, ফল প্রকাশের সময় মাস গড়িয়ে বছরে পৌঁছলে ও দেখবার বা বলবার কেউ নেই। 'গণ-টোকাটুকি'র যুগ ছাড়িয়ে বর্তমানে শিক্ষার 'গণতন্ত্রীকরণে'র হাতে পড়ে ছাত্ররা হতাশ, বিস্মিত ও বিরক্ত। ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রদের স্বার্থ ছেড়ে স্ব স্ব দলীয় স্বার্থ অনুসারে আন্দোলন চালাচ্ছে। ফলে শিক্ষক, অশিক্ষক, সরকার উপাচার্য প্রত্যেকের 'যথার্থ আন্দোলনের' ফল ভেড়ার পালের মতো ভুগে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এই দুঃখজনক, হতাশাকর পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীরা মানসিক অবস্থা কি তা জানতেই এই সমীক্ষা।

সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখাটি প্রস্তুত করেছেন অঞ্জন গুহঠাকুরতা।]

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী/প্রেসিডেন্সি কলেজ

ভাবতে অবাক লাগে কেন পড়তে এলাম কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এরা বোঝেনা পরীক্ষার ফল ঠিক মতো না প্রকাশিত হলে ছাত্রদের কিভাবে সময় নষ্ট হয়। এই চাপিয়ে দেওয়া অকর্মণ্যতার জন্য ছাত্রদের জীবিকার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে ; উদ্যম, সৃজনীশক্তি সবকিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাঙালী রাজনীতি সচেতন—আজ এই ঐতিহ্য প্রায় অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা কিছু দেখ তাতেই politicization। ভাবুন তো, সরকারী তোষামুদে দল দিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় চালানো—কি আজগুবি, বোকার মতো আব্দার !

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে নোংরা রাজনীতি করতে আজ আর বাধছে না। এই সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে রাজনীতি করা শুধু অপমানকরই নয়, ঘৃণ্যও। আমার তো ধারণা কোন প্রকৃত শিক্ষাবিদ্ বা শিক্ষক রাজনীতির নাম করে শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারেন না। আসলে শিক্ষাদানে ব্যর্থ একদল শিক্ষক নিজেদের নাম বাড়াতে রাজনীতির নাম করে খেলার আসরে নেমে পড়েছে।

বিপ্লব লোহ চৌধুরী/বিবেকানন্দ কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে এখন অধ্যাপক পরিচয়টা গৌণ ; আগে তো যে যার দলের তাত্ত্বিক—তারপর কেউ অর্থ-নীতি, কেউ সাহিত্যের অধ্যাপক ইত্যাদি। আমার মনে হয়, যে রাজনৈতিক সত্তা বজায় রেখে এঁরা এঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, যদি দলমত নির্বিশেষে দলীয় নেতাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন যে এঁরা প্রথমে শিক্ষক। ছাত্রদের বছর নষ্ট করার নাটকে কুশীলব নন। কিন্তু এঁরা তা করবেন কি ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে অশিক্ষক কর্মচারীদের ভূমিকাও যথেষ্ট নয়। তাঁরা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী, পরে রাজনীতিক হিসাবে নিজেদের দেখুন। সকলে বিধিবদ্ধ কর্তব্য করলেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ছাত্ররা কি করবে ? ছাত্রস্বার্থে বৃহত্তর পটভূমিকায় অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, সে সংগঠন খুঁড়িয়ে চলা শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাকে উদ্‌ঘাটিত করে তার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করবে।

অমিত চৌধুরী/প্রেসিডেন্সি কলেজ

যে সমস্ত সমস্যার জন্য অশিক্ষক কর্মচারীরা কর্মবিরতি বা প্রতিবাদ সভা করছেন, তা সমাধানের জন্য অন্য পথ আছে। অন্ততপক্ষে সরকারকে অনুরোধ করে কমিশন নিয়োগ করে, অথবা কোর্টে গিয়ে তাঁরা সমাধান চাইতে পারেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিটিং মিছিল করে কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। বরং এর ফলে ছাত্র-সমাজের মধ্যে এঁদের সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হবে।

ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের পার্টি রাজনীতি ছেড়ে অন্তত শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মিলিতভাবে আন্দোলন করতে পারে। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রসংসদগুলো এ ব্যাপারে একত্রিত হয়ে একটা কিছু করতে পারে মিলিত আন্দোলনে সেনেট-সিণ্ডিকেটে বেশী করে ছাত্রপ্রতিনিধির দাবী করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে ছাত্রদের আরও ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ঘটলে সমস্যাগুলোতে ছাত্রদের দিকটা অন্তত শোনা হবে, এখন যেটা একেবারেই হচ্ছে না।

নৈবেদ্য চট্টোপধ্যায়/প্রেসিডেন্সি কলেজ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে শান্তিনিকেতনী ঢঙে উন্মুক্ত পরিবেশে যে ঝাণ্ডা ক্যাস হয়ে চলেছে তা দেখে মনে হচ্ছে সদ্যজাত শিশুরা মাতৃদুগ্ধের জন্য ঝাণ্ডা ধরছে না কেন ? একদিকে বিশাল উর্বর ক্ষেতে সোনার ঝাণ্ডা সোনালী রোদে মাথা দোলাচ্ছে আর অন্যাদকে চাষীর পেট দুবেলা পূর্ণ আহারের আশা করে বসে আছে।

অবাক চোখে দেখি বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদগুলোর কাজকর্ম। এখনও তাদের ছাত্রদরদী মনোভাব কলেজ ছাড়িয়ে বেরোয়নি। নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে এরা এরা যোগ দিতে পারে যখন তখন, কিন্তু নিজের ঘরে আগুন লাগতেও এরা কেউ সোচ্চার হল না, ভাবতেও অবাক লাগে। ছাত্র সংসদের পক্ষে ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত স্বার্থ সর্বাগ্রে ভাবা দরকার। ছাত্ররা তো শুধুই তাদের ভোট ব্যাংক নয়।

মহুয়া পাল/ব্রেবোর্ণ কলেজ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ঘটনা ঘটছে, সে রকম গণ্ড গোলতো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়াট ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ঘটছে। তার মানে কি এই যে সব বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের আওতায় চলে যাক এটাই আমরা চাইবো ? কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলেই যে প্রশাসন ব্যবস্থা খুব চমৎকার হয়ে যাবে এমন তো নয়। তাহলে তো সমস্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক অব্যবস্থার থেকে মুক্ত হত। তা হচ্ছে কি ?

আমরা ছাত্রছাত্রীরা কর্মচারীদের প্রচুর নিন্দা করতে পারি, উপাচার্যকে ঘেরাও করে দিনের পর দিন বসে থাকতে পারি : কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব কাজ পড়ে থাকার ফলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ এই রকম অনিশ্চিত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেই কাজগুলো আমরা নিজেরাই (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নয়) যতটা পারি করে দেব বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি না কি ? তা যদি করতে রাজি না থাকি তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেয়োখেয়ির রাজনীতির ওপর দূর থেকে গালাগালি বর্ষণ করে বিশেষ লাভ হবে না। কারণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে দুই বিরোধী দলের সমর্থক যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ রাজনৈতিক খেয়োখেয়ি চলতেই থাকবে। খেয়োখেয়ি কমতে পারে একমাত্র যদি সব প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শাসক দলের হাতে চলে যায় অথবা পুরোপুরি রাজ্য শাসক পার্টির হাতে চলে আসে। 'শিক্ষাব্রতীদের' শুভবুদ্ধি উদয়ের আশায় বসে থেকে তেমন ফল হবে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিকারী আচার্যই যেখানে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কখনোই 'রাজনীতিমুক্ত' হতে পারে না। রাজনীতি যাতে খেয়োখেয়ির পর্যায়ে না চলে যায়, আর ছাত্ররা যেন সব সময় উলুখড় না বনে, এটাই সব সুস্থ মানুষের কাম্য হওয়া উচিত।

সঞ্জয় মুখার্জী/প্রেসিডেন্সি কলেজ

আমার ধারণা, ছাত্রদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রধানতঃ দুটি দায়িত্ব। প্রথমত, কোনো পাঠ্য বিষয়ে এখন পর্যন্ত লব্ধ জ্ঞান ছাত্রকে দৈনন্দিন পাঠদানের মধ্য দিয়ে জানানো। আর দ্বিতীয়ত, গবেষণার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাদানের বিষয়ে নতুন দিক গুলোতে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মোটামুটিভাবে প্রথম দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। কিন্তু এ দ্বিতীয় দায়িত্ব পালন করেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, এমনকি নেই বললেই চলে। কিন্তু এ কাজটি অত্যন্ত দরকারী এবং এজন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের জন্য বাধ্যতামূলক গবেষণা প্রকল্পের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বর্তমান সরকার এ ধরনের কোন উদ্যোগ নেন নি, অদূর ভবিষ্যতেও নেবেন বলে মনে হয় না। তাই শিক্ষক বা শিক্ষাবিদ হিসাবে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেশীর ভাগকেই যোগ্য বলে মনে হওয়া শক্ত।

আমার মনে হয়, উপাচার্যের প্রাথমিক কর্তব্য পরিচালক হিসাবে এবং উপাচার্য পদাধিকারীর প্রধান গুণ হওয়া উচিত তাঁর পরিচালনগত দক্ষতা : শিক্ষাগত যোগ্যতা এখানে গৌণ। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করবার জন্য উপাচার্যকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিশৃঙ্খলা আমার তো মনে হয় এর পরিচালন কাঠামোতেই লুকিয়ে আছে।

পথিক তাকেই বলো

স্বপন রায়

পথিক তাকেই বলো
নক্ষত্রের আবর্তন যাকে দেখে উপলব্ধি করো
পথিক তাকেই বলো
পাঠশালার দেয়ালে যে সঁপেনি মন
পথিক তাকেই বলো
প্রেমের পরাগরেণু যে শুধু ছড়িয়ে যায়
পথের দুধারে।

দুটি কবিতা

কৃত্তিবাস রায়

নদীমাতৃক

স্বদেশে ছিল যদিও নদীমাতৃক
সভ্যতা আর সঘন মেলামেশা
এখানে হাওয়া সংগহানের প্রীতি
স্পন্দিত ও তুমুল পরিহাসে
একলা হাওয়ায় এখানে মেলামেশা।

মানুষ এখানে একলা হাওয়া ভাসে
একলা হাওয়ায় এখানে মেলামেশা
নীরবতায় সকল সন্দেহ
এখানে হাওয়া গহন পরিহাসে
কোমলতায় দাঁড়িয়ে অপলক।

ভারতবর্ষ

ভ্রান্তিবিলাসী সহচর প্রিয়তম
তুমি মেলে ধর অতসী কুসুম হাতে
কবে যেন তার গরদ রঙের মুখ
কেঁপে ওঠে খুব ; আকাশ সাজাতে তাতে

খেলা যে তোমার কখনও ফুরোবে আঁখি
কিভাবে এমন ইশারায় দিয়ে যাও
তবে কি ছিল না এ বাল্যপ্রবণতা ?
কিভাবে এমন চোখের পলকে চাও ?

অতসী কুসুম তুমি মেলে ধর হাতে
সময় গিয়েছে কবে দেহ-পরবশ
ছায়া ঘনতর অবেলায় আসে শুধু
শৈশবময় সহজিয়া বেদনাতে।

কলেজ প্রাসঙ্গিকী

গত ২০শে জানুয়ারী কলেজ ১৬৯ বছরে পড়ল। যদিও কলেজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা আজ পুরনো ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়েছে তবুও বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই কলেজ অনেক আনন্দের ও গর্বের বস্তু। শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, ছাত্রছাত্রী—সকলের আন্তরিক চেষ্টায় কলেজের দৈনন্দিন জীবন কাটছে সুখে দুঃখে, উচ্ছ্বাসে হতাশায়।

বিভাগীয় সংবাদ

অর্থনীতি :

পরীক্ষার ফল বেশ ভাল। বিভাগের 'সেণ্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ' পরিদর্শন করে গেছেন ইউ. জি. সি. র থেকে পাঠানো একটি বিশেষজ্ঞ দল। অধ্যাপক এম. কে. রক্ষিত জাতীয় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

ইংরেজী :

বিভাগ থেকে এ বছর একটি কবিতা ও ছোটগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল। অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্ত্তী তাঁর পি. এইচ. ডি. গবেষণা পত্র জমা দিয়েছেন। পরীক্ষার ফল মোটামুটি ভাল।

ইতিহাস :

বিভাগে এবার সাতটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় প্রধান ডঃ রজত রায় লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছেন।

উদ্ভিদবিদ্যা :

গবেষণা পুর্নোদ্যমে চলছে। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল ভালো। অধ্যাপক সুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য এবারে অবসর নিয়েছেন। বিভাগের হলেকাটক লাইনে এখনো এ. সি. আনা যায়নি। তাছাড়া সরকারী অনুদান কম থাকায় যন্ত্রপাতি মেরামত ও দরকারী রাসায়নিক কেনার অসুবিধা হয়।

গণিত :

বিভাগে দুটি অধ্যাপক পদ এখনো শূন্য। স্থানাভাবের জন্য ক্যাস নেওয়ার চূড়ান্ত অসুবিধা হয়। অবজারভেটারিতে বিভাগের টেলিস্কোপটি আছে কিনা জানা যায় না।

দর্শন :

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগীয় প্রধান ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী বিশ্বভারতী ও যাদবপুরে আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখ-যোগ্য। সেমিনার ঘরে সুপরিচিত দার্শনিকদের ছবি বাঁধাই না হয়ে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

পদার্থবিদ্যা :

ডঃ এ. কে. রায় চৌধুরী বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। পরীক্ষার ফলাফল ঐতিহ্য অনুসারী। এ বছর এ বিভাগের তিনজন অধ্যাপক পি. এইচ, ডি করেছেন। ডেমনস্ট্রেটর ক্ষেত্রধন ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করেছেন। প্রাচীর পত্রিকা "দ্রিঘাংচু" ফিরে এসেছে।

প্রাণীবিদ্যা :

পঠন পাঠন ও গবেষণা পুরোদমে চলছে। বিভাগীয় প্রধান এস. কে. দাসগুপ্ত "প্রাণীজগৎ" নামে একটি বই লিখেছেন। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ নিয়েছেন।

বাংলা :

বিভাগের পড়াশোনা এবং গবেষণা সমানতালে চলছে। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এ বিভাগে বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে তিনদিনের এক বক্তৃতা মালা প্রদান করেন। দেওয়াল পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সেমিনার ও ইউ. জি. সি. লাইব্রেরিতে বই দেওয়া নেওয়া আপাতত বন্ধ।

ভূগোল :

ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল অন্যান্য বছরের মতোই। গবেষণা সমান তালে চলছে। এ বছর বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

ভূতত্ত্ব :

বিভাগের প্রধান পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ড. এ কে সাহা। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অধ্যাপক পি কে গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন cosist পরিকল্পনায় এ বিভাগকে অর্থসাহায্য দিচ্ছে। ফলে বর্তমানে

বিভাগটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এ বছর বিভাগে এস রায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। মার্চ মাসে এ বিভাগে তিনদিনের একটি জাতীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের পত্রিকা 'ভূ-বিদ্যা' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

রসায়ন :

নিয়মিত সেমিনার হচ্ছে। বিভাগের ছাত্র অর্ক মুখার্জী এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পর্বতারোহণের বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। নতুন দেওয়াল পত্রিকা 'কোমিয়া' এখনও পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে।

রাশিবিজ্ঞান :

পরীক্ষার ফলাফল বরাবরের মতো ভালো। অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ দাস কলেজের 'বারসার' পদাভিষিক্ত হয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরা বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা 'ক্যাকটাস' নিয়মিত প্রকাশ করছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান :

এ বছর বিভাগে এ রজত জয়ন্তী পুনর্মিলন উৎসব পালিত হয়েছে। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের একটি সমিতিও গঠিত হয়েছে। নিয়মিত সেমিনার হচ্ছে। বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক রমেশচন্দ্র ঘোষ ও নির্মলচন্দ্র রায়চৌধুরী পরলোক গমন করেছেন।

শারীরবিদ্যা :

এ বছর এ বিভাগের রজতজয়ন্তী পুনর্মিলন উৎসব পালিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা সেমিনার লাইব্রেরীতে নতুন করে বই ও পত্রপত্রিকা পাচ্ছে। সেমিনার নিয়মিত হচ্ছে। এ বছর থেকে এ বিভাগে জে. এন. মৈত্র স্মরণে জনবোধ্য বক্তৃতার আয়োজন করা হবে। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক।

হিন্দী :

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বিভাগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা 'দেশরত্ন' নিয়মিত বেরোচ্ছে।

গ্রন্থাগার :

কলেজ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ছাত্র সংসদ গত বছর আন্দোলন করে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারছে। বই ইস্যুর সময়ও দরকার মতো বদলানোর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। দুজন গ্রন্থাগারিক এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টায় কয়েকটি পুরোনো ক্যাটালগ নতুন করে লেখা সম্ভব হয়েছে।

কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান সমস্যাগুলির অন্যতম হ'ল স্থানাভাব ও বই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব। এ ছাড়া গ্রন্থাগারে বিশেষ প্রয়োজন ভিত্তিক কর্মী কাঠামো না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করার ব্যাপারে এবং বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনক্রম তাদের কাজের গুরুত্ব অনুসারে স্থির করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হলে গ্রন্থাগারের সমস্যা কিছুটা সমাধান হতে পারে।

অন্যান্য খবর

আন্দোলন :

১৯৮৪ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে শারীরবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবীতে বিভাগের দরজায় তালা লাগিয়ে অবস্থান ধর্মঘট করে। শারীরবিদ্যা বিভাগের ৮০ বছরের ইতিহাসে ছাত্র-অসন্তোষ জনিত এরকম আন্দোলন আগে কখনো হয়নি।

শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে হঠাৎ তিনজন শিক্ষকের বদলী, সেমিনারে বই না পাওয়া, রাসায়নিক দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে ব্যবহারিক ক্লাস বন্ধ হওয়া, বিভাগের স্টোরকিপারের অসহযোগিতা এবং বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যক্ষের গড়িমসি ভাব—এ সমস্ত কারণে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় আন্দোলন করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। বর্তমান বিভাগীয় প্রধানের ব্যক্তিগত প্রয়াসে বিভাগে অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে গবেষণা এখনও চালু হয়নি এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট ঘর (পুরোনো রসায়ন বিভাগে) এখনও ব্যবহারের উপযোগী হয়নি।

ভূগোল বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও সেমিনার লাইব্রেরি থেকে নিয়মিত বই না পাওয়ায় এবং বিভাগে অনিয়মিত ভাবে ব্যবহারিক ক্লাস হওয়ায় আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। আপাতত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ ব্যবহারিক ক্লাস নিয়মিত হচ্ছে। কিন্তু সেমিনারে বই দেয়া অদ্যাবধি শুরু হয়নি।

চলচ্চিত্র-সংসদ :

প্রেসিডেন্সি কলেজ চলচ্চিত্র সংসদ কলেজে সক্রিয় ছাত্র সংগঠন গুলোর অন্যতম। সংসদ কলেজ প্রেক্ষাগৃহে এখনও পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটির মতো ছবির প্রদর্শনী করেছে। বার্গম্যানের ছবির উপর একটি এবং নিউওয়েভ জার্মান ছবির উপর একটি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজনও করা হয়েছে। এ ছাড়া খুব সম্প্রতি 'চারুলতা' ছবিটি নিয়ে দুদিনের একটি আলোচনা সভাও সাফল্যের সঙ্গে চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজন করে। সংসদের বুলেটিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয় :

বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার প্রসার, কুসংস্কারের বিরোধিতা এবং বিজ্ঞানের ক্ষতিকারক দিকগুলোর বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সংস্থার জন্ম হয়। বিভিন্ন স্কুলে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত শিক্ষা প্রসারে এই সংস্থা উদ্যোগী হয়ে

কাজকর্ম করে চলেছে। ভূপালের দুর্ঘটনায় আক্রান্ত মানুষের জন্য এই সংস্থা 'জনস্বাস্থ্য-কেন্দ্রে' অর্থসাহায্য পাঠিয়েছে।

দ্রিঘাংচু :

গত ২, ৩, ও ৪ ফেব্রুয়ারী আন্তঃকলেজ উৎসব 'দ্রিঘাংচু' অনুষ্ঠিত হল।

এ বছর কলেজ উৎসবে বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধিত্বে একটু ভাটা পড়েছিল। তবে উৎসব কমিটি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই কাজ চালিয়েছেন। এ জন্য ছাত্র-সংসদের প্রাক্তন সাধারণ-সম্পাদক পার্থ সেন ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

প্রাক্তন ছাত্র সমিতি :

কলেজের বেশ কিছু সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছেন প্রাক্তন ছাত্রসমিতি। এঁরা এবার থেকে বছরে দুজন ছাত্রকে বার্ষিক বৃত্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এঁরা কলেজ গ্রন্থাগারে ৫০০০।৮ ইনডেক্স কার্ড সরবরাহ করে বিশেষ উপকার সাধন করেছেন। আশা করা যায় কলেজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-গুলিতেও প্রাক্তন ছাত্রসমিতি এগিয়ে এসে সাহায্য করবেন।

প্লাটফরম :

কলেজের নানা বিভাগের বেশ কিছু উৎসাহী ছাত্রছাত্রী কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদেরকে নিয়মিত পড়াচ্ছেন এই সংগঠনের মাধ্যমে। এদের আন্তরিক উৎসাহ এবং এই সাধু প্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

সার্ভে :

তিনজন ছাত্রছাত্রীর চেষ্টায় Presidentians of Today নামে সার্ভে।৮ ছাপানো হয়েছে এঁরা হলেন সঞ্জয় মুখার্জী (অর্থনীতি) চান্দ্রেয়ী নিয়োগী (ইংরেজী) এবং ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী (রাশিবিজ্ঞান)।

এ্যাথলেটিক ক্লাব

কলেজের মাঠটি নতুন করে তৈরী করার পিছনে এ্যাথলেটিক ক্লাব আন্তরিক ভাবে খেটেছে। ক্রিকেটের নতুন পীচ বানানো হয়েছে। নিয়মিত ভলিবল ও ব্যাডমিন্টন খেলা হচ্ছে।

ফুটবলে ভূতত্ত্ব বিভাগ গণিত ও র‍্যাশাবজ্ঞানের যৌথ দলকে হারিয়ে কলেজ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। কলেজ ক্রিকেট দল বাইরের তিনটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। আমাদের কলেজের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা এখনও হয়নি। ভলিবলে রসায়ন বিভাগ ভূতত্ত্বকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

এ্যাথলেটিক ক্লাব কলেজে বাস্কেটবল কোর্ট তৈরীর চেষ্টা করছে।

খুচরো খবর

প্রমোদের ক্যান্টিন দুবার জায়গা বদল করে আবার পুরোনো জায়গায় ফিরেছে। নতুন রঙ করা হলেও দেওয়ালে নিয়মিত পোস্টার লাগানো হচ্ছে। ক্যান্টিনে টিউব লাইটও ওয়াটার-কুলার লাগানো হয়েছে। এজন্য পি. ডব্লু. ডি. (ইলেক-ট্রিক্যাল) কে ধন্যবাদ। আড্ডা নিয়মিত হচ্ছে; প্রমোদের কাছে ছাত্রদের ধারও বাড়ছে। প্রমোদের পরিবারের সাথে কলেজের প্রায় চার যুগের সম্পর্ক। কলেজ কর্তৃপক্ষ কি ওকে থাকার জন্য একটি আলাদা ঘর দিতে পারেন না?

সাইত্রিশ বছর কলেজে কাজ করে বিপিনদা অবসর নিলেন। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কলেজ গেটে জনি ওরফে রামদেও সিং তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

স্টুডেন্ট সেকশনে অক্লান্ত উদ্যমে স্মিতহাসি ও সুপুরি সংযোগে কাজ করে চলেছেন দিলীপদা এবং অন্যেরাও।

কলেজ নতুন রঙ পড়ল বেশ কয়েক বছর পর। কলেজের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলো একটু বাঁচিয়ে পোস্টার মারলে কিছুদিন সৌন্দর্য বজায় থাকবে।

গত ১৮ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে বেকার হলের নাম রাখা হল ডিরোজিও হল।

প্রকাশন সচিবের প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। এই কলেজের সঙ্গে অনেক দিক্‌পাল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সম্পর্ক ছিল। আবার অন্যান্য অনেক দিক্‌পাল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে যে প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনো সম্পর্ক ছিলনা--এটাও ঠিক। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে এই বুদ্ধিজীবীদের যে সম্পর্ক ছিল, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবর্তনে তাঁদের যে সামাজিক ভূমিকা, তার ভিত্তিতেই তারা শ্রদ্ধার্হ হয়েছেন ; প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে তাঁদের কি সম্পর্ক ছিল তার ভিত্তিতে নয়। এই অতি সরল সত্যটি উল্লেখ করার দরকার এই কারণেই যে আজকের প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে তাঁদের অনেকে প্রেসিডেন্সির একটি reified ঐতিহ্য বা ভাবমূর্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট। প্রেসিডেন্সির এই ভাবমূর্তি-কেন্দ্রিকতার জন্য তাঁরা প্রায়শই ভুলে যান যে সব থেকে মৌলিক পরিচয়ে তারা সামাজিক মানুষ —এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি তাঁদের কিছু কিছু দায়িত্ব আছে।

কলেজের ছাত্র-শিক্ষকের কাছে কলেজটাই দৈনন্দিন শিরঃ-পীড়ার বিষয়বস্তু—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিজস্ব কলেজ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর স্নেহ সব ছাত্র ও শিক্ষকেরই থাকে, থাকাটা উচিতও বটে। কিন্তু স্নেহে অন্ধ হয়ে আমরা মনে করতে পারিনা যে কলেজের সমস্যাগুলিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে আমরা প্রেসিডেন্সির ভাবমূর্তিকে গৌরবোজ্জ্বল রাখবো। কলেজের মধ্যে আমরা যে সব সমস্যা নিয়ে পীড়িত সেগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—সামগ্রিক সমাজের কিছু বৃহত্তর সমস্যার প্রতিফলন। আর কিছু না হলেও এই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা, অন্ততঃ এগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আমাদের দায়িত্ব। আর প্রেসিডেন্সি এবং অন্যান্য সরকারী কলেজ চালানোর জন্য যে সব নাগরিক কর দিচ্ছেন তাঁদেরকে এই সমস্যাগুলি জানানোর দায়িত্ব যদি আমরা এড়িয়েও যাই তাহলেও অন্ততঃ নিজেদের স্বার্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তাটা আমরা অত সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারবোনা।

আমাদের কলেজে যে সব সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কলেজে সমস্যাগুলি ঠিক সে ধরনের নয়। ফলে আমরা মনে করতে পারি যে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও তার সমস্ত সমস্যাই অনন্যসাধারণ। কিন্তু আমাদের কলেজ এবং অন্যান্য কলেজের সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে যতই ভিন্ন ধরনের হোক না কেন সবগুলির মূলেই যে কয়েকটি বিশেষ সামাজিক শক্তি কাজ করছে তা মনে রাখা ভাল।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে যে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। সমীক্ষার পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাই যে আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে যতখানি মেধাবী ছাত্রছাত্রী আসত আজ-কালকার ছাত্রছাত্রীরা ঠিক ততটা মেধাবী নয়। বেশ কিছু শিক্ষকের যোগ্যতা সম্বন্ধেও ছাত্রছাত্রীরা খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেনা। সমস্যাটির মূল খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে অনেক ছাত্র এবং কিছু শিক্ষক রাজ্য সরকারের কয়েকটি নীতি সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। এর মধ্যে অন্যতম বদলি নীতি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে একমাত্র 'মেধাবী' ছাত্রছাত্রীরা প্রবেশাধিকার পায় বলে অনেকে প্রেসিডেন্সিকে 'এলিট' কলেজ বলতে ভালবাসেন। তাঁরা মনে করেন এই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'উত্তম' শিক্ষার সবরকম সুযোগসুবিধা থাকা উচিত। প্রেসিডেন্সির 'elitism' আপাতদৃষ্টিতে মেধার আভিজাত্য। অথচ আভিজাত্য শব্দটির মধ্যে বৈষম্যের ইঙ্গিত খুব উগ্র। সাম্যবাদী বা নেহাৎ নিরীহ 'বৈষম্যহীন' (egalitarian) সমাজই যদি আমরা চাই তাহলে বিশেষ সুবিধাভোগী 'অভিজাত' কলেজ কেন থাকবে? কিছু ছাত্র অন্য ছাত্রদের থেকে বেশী মেধাবী হবে এটা অবশ্য এই পর্যায়ে রোধ করা যাবেনা। তাহলে কি করা যাবে? সব শ্রেণীর ছাত্ররাই যাতে উত্তম শিক্ষা ও মেধা বিকাশের সমান সুযোগ পায় তা দেখতে হবে। সেটা কি করে হবে? না, উত্তম শিক্ষকদের শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সির মত সুবিধাভোগী কলেজে আবদ্ধ না রেখে মফস্বল কলেজে পাঠিয়ে দিতে হবে। যাতে মফস্বল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা 'উত্তম' শিক্ষার সুযোগ পায়। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটা এইরকম। কিন্তু মফস্বল শহরের বা গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা প্রায় কেউই কলেজে পড়ার সুযোগ পায়না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সব ছাত্র কলেজে পড়তে আসে তারাও

PRESIDENCY COLLEGE

টিউশানি (বা অন্য কোনোভাবে অর্থ উপার্জন) করে, টাইপিং অথবা অন্য কোনো অর্থকরী বিদ্যা শিখে মেধা বিকাশের বিলাসিতায় খুব বেশী সময় দিতে পারেনা। উত্তম শিক্ষক কি করে তাদের উচ্চশিক্ষার মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলবেন? তাছাড়া উত্তম শিক্ষা এবং মেধা বিকাশের সহায়ক অন্যান্য যে সব সুযোগ সুবিধা কলকাতায় পাওয়া যায় তা মফস্বলে বা গ্রামে নেই—এই সরল সত্যটির মুখোমুখি দাঁড়ানো ভাল।

'অভিজাত' কলেজের 'উত্তম' শিক্ষকেরা যদি মফস্বল কলেজের শিক্ষণ পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন এবং স্থানীয় মেধাবী ছাত্রদের উপকারে লাগেন তাহলেও যে সব ছাত্ররা কিছুটা উপকৃত হবে তারা উচ্চ অথবা উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। গ্রাম অথবা মফস্বল শহরের উচ্চ-উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার 'মেধাবী' ছেলেমেয়েদের কলকাতায় পাঠিয়ে পড়াশোনা করানোর সংগতি রাখেন এবং সাধারণতঃ তাই করেন। উত্তম শিক্ষকদের মফস্বলে বদলী করে যদি স্থানীয় জনসাধারণের তেমন কোনো লাভ না হয় তাহলে এই উত্তম শিক্ষকদের ক্রমশঃ কর্মহীন এবং নিরুৎসাহ করে তুলে লাভ কি? তাছাড়া তাঁদের মনটা তো পড়ে থাকবে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বেশী মেধাবী' ছাত্রছাত্রীদের দিকে (এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের অসম্পূর্ণ গবেষণার দিকে)। বদলী নীতি কার্যকরী হবার ধরণ দেখে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সন্দেহ যে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কিছু শিক্ষক এই কলেজে অধিষ্ঠিত হবার জন্য অত্যুৎসাহী; তাঁদের জায়গা করে দেবার জন্যই অপেক্ষাকৃত যোগ্য শিক্ষকদের অন্যত্র বদলি করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে এ সন্দেহের নিরসন করা।

সাম্প্রতিক সমীক্ষার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী উচ্চ উচ্চমধ্যবিত্ত, এমন কি ধনী পরিবারের সন্তান। আমাদের দেশে উচ্চবিত্তের যে উচ্চশিক্ষায় বেশী অধিকার এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকার ব্যাপারে তত্ত্বগত কোনো বাধা নেই। তাহলে তাদের সংখ্যা এই কলেজে এত কম কেন? আশু আর্থিক নিরাপত্তার প্রয়োজন বেশী বলে হয়তো তারা কারিগরী বা অন্যান্য বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। এর মধ্যেও যারা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজেই আসতে চায় তাদের অনেকটা সুবিধা হয় যদি এই কলেজে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আরো বেশী করে সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা হয় এবং মেয়েদের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি হোস্টেল খোলা যায়। যদি সরকারী কলেজগুলিতে পারিবারিক আয় এবং পরিবারের সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের ফি দেবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সহজেই যোগাড় করা যাবে। তবে আয় নিরূপণের এবং বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা সাঠক হওয়া দরকার।

ভর্তি পরীক্ষা তুলে দিয়ে কি প্রেসিডেন্সি কলেজে দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করা যাবে? সাম্প্রতিককালে একটি কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন মন্ত্রীপুত্র পরীক্ষায় কোনো যোগ্যতার পরিচয় না দিয়েও যেরকম অলৌকিক উপায়ে প্রবেশাধিকার পেয়ে গিয়েছেন সেরকম যে এখানেও ঘটবে না এমন আশ্বাস কে দিতে পারেন? ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম বজায় থাকলে যে সব ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেনি তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার আর একটি সুযোগ পাবে। বরং ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সব বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা যাতে বাংলায় হতে পারে এবং কোনো বিভাগে কোনো ক্ষমতাসীন অধ্যাপক যাতে কাউকে অসদুপায়ে ভর্তি করতে না পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। বিভাগীয় দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকদের সংখ্যা এখনো বেশী নয়। ছাত্র ও সৎ কর্মচারীরা একটু নজর রাখলেই এ ধরণের ঘটনা আটকাতে পারবেন।

আর্থিক আভিজাত্য বা মেধার আভিজাত্য যা-ই হোক না কেন, প্রেসিডেন্সির নাম থেকে আভিজাত্য দূর করার চেষ্টা করলেই তা চলে যাবেনা। বর্তমান সমাজে আর্থিক আভিজাত্য এবং মেধার আভিজাত্য পরস্পরনির্ভর। 'প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীরা সমাজজীবনে নতুন চিন্তার দিশারী' এরকম একটি অনুচ্চারিত মনোভাব অনেক শিক্ষিত বাঙালীর মনে লুক্কায়িত আছে। প্রেসিডেন্সির বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা বেশীর ভাগই কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। পুঁজিবাদী শিল্প সভ্যতার যুগে মানুষ এমনিতেই নিজের সামাজিক অস্তিত্ব থেকে ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে। 'নিজের মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে' ডুবে থাকার একটি মসৃণ যুক্তিপূর্ণ রূপ দেখা যায় প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। মেধার আভিজাত্যের সঙ্গে আর্থিক আভিজাত্যের যে সম্পর্ক তাতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করবে এটা স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্সির যে মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রী বৃহত্তর সমাজ নিয়ে 'ভাবা প্র্যাকটিস' করে তাদের কয়েকজন (সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের বিশ্লেষক) লেখে:

It may be realised that over the years, the absolute number of brilliant students in our society has increased significantly, perhaps due to the greater amount of competitiveness to which the students of today are exposed. Morover, it is also true that nurturing of brilliance has economic roots (keeping in mind the effect that nutrition may have on the development of the human intellect). Thus *the economic progress of our country* (over a period of two decades or more) has created

a relatively more congenial atmosphere for the efflorescence of the '*best in human beings*'....

আমাদের দেশের সাম্প্রতিক 'অর্থনৈতিক প্রগতি' মানুষের (সম্ভবতঃ সব দেশবাসীর কথাই বলা হচ্ছে) মেধা বিকাশে সহায়ক হয়েছে একথা একমাত্র মধ্যবিত্তসুলভ কূপমণ্ডূকতা নিয়েই এত নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব।

সমাজজীবনে প্রেসিডেন্সির বর্তমান 'মেধাবী' ছাত্রছাত্রীদের কি অবদান থাকবে তা একমাত্র ইতিহাসই বলতে পারে। আপাততঃ প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীরা আমরা সকলেই সর্বতোভাবে প্রতিযোগিতাপরায়ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় (কিংবা আন্তর্জাতিক পরীক্ষায়) ভাল ফল করার চেষ্টা করা ছাড়া ছাত্র হিসাবে আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্যান্যদের থেকে ভাল ফল করেই যখন প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ঢোকার প্রথম প্রবেশপত্র পায় তখন কলেজে ঢুকে পরীক্ষার ফলের প্রতিই একনিষ্ঠ মনোনিবেশ করা অস্বাভাবিক নয়। প্রেসিডেন্সি এবং প্রেসিডেন্সির ছাত্র শিক্ষক সকলেই একটি প্রস্থানের (system) অন্তর্ভুক্ত। এই প্রস্থান এবং সামাজিক বাস্তব সম্বন্ধে উদাসীন থেকে একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হওয়া যায় না এটা আমাদের সকলেই একদিন না একদিন বুঝতে হবে। তবে আমরা অনেকে বোঝার চেষ্টাই করবোনা, অনেকে বুঝতে পারবোনা, আবার কেউ কেউ বুঝেও না বোঝার ভান করবো এটাও হয়তো ঠিক। আমাদের উত্তরসূরীরা যদি কলেজ পত্রিকাকে নিছক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র বলে মনে না করে এবং পত্রিকার লেখা বা আলোচনাগুলিকে যদি ক্রমশঃ বৃহত্তর সমাজমুখী করার প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে তাদের ভাবষ্যৎ প্রয়াসের উদ্দেশে আমাদের অভিনন্দন রইল।

আর একটি কথা। কলেজ পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন নেওয়া কারো কারো মতে কলেজের সনাতন ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কলেজের বাইরে কোনো পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে অবশ্য বিজ্ঞাপনের ভূমিকাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কলেজ পত্রিকার ক্ষেত্রেও আমরা প্রায় সেইরকমই একটি চূড়ান্ত অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। পত্রিকা-খাতে সরকারী বরাদ্দ বছরে তিন হাজার টাকা। ঐ টাকায় pamphlet প্রকাশ করা সম্ভব; পত্রিকা কিছুতেই নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বছরে একটি করে pamphlet প্রকাশিত হলেও ভাল লেখার স্থান অকুলান হবে না। সীমিত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা সম্ভব হবে। কিন্তু অনেকের আশংকা এই যে pamphlet হলেই তা 'অশোভন' রাজনৈতিক 'propaganda'য় সমৃদ্ধ হবে এবং প্রেসিডেন্সির ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করবে। সাদাশা পত্রিকা সময়মত প্রকাশ করতে হলে কিন্তু বিজ্ঞাপন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। বাৎসরিক pamphlet, চতুর্বাষিক পত্রিকা আর বিজ্ঞাপনসমৃদ্ধ বাৎসরিক পত্রিকা—এই তিনটি বিকল্পের মধ্যে তৃতীয়টিকেই আমরা এ বছর বেছে নিলাম। বিজ্ঞাপনের দ্বারাকলেজের ঐতিহ্যহানি হচ্ছে বলে যাঁরা মনে করছেন তারা অন্য দুটি বিকল্পের কথা ভেবে দেখতে পারেন।

পরিশেষে, কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে আমরা প্রতি পদে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাদের ধন্যবাদ জানাই। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅচিন্ত্য কুমার মুখোপাধ্যায়, পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীগৌরীশংকর ঘটক ও শ্রী সুকান্ত চৌধুরী শুভেচ্ছা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা নিয়ে আমাদের পাশে থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে না থাকতে পারলেও অধ্যাপক শ্রী দেবজ্যোতি দাশ আমদের প্রথম থেকেই উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন নি। শ্রী সুবীর পোদ্দার ও পপুলার লিটল প্রেসের সমস্ত কর্মচারী বন্ধুদের সাহায্য না পেলে আমরা হয়তো এ বছর কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করেই উঠতে পারতাম না। ১৯৮৫-৮৬র কলেজ পত্রিকার জন্য আমরা এঁদের সকলের কাছে ঋণী।

তাছাড়া, যে সব অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্র বন্ধুরা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছেও আমরা কম কৃতজ্ঞ নই। পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে লেখা না পাবার সম্ভাবনাটাই প্রধান বিভীষিকা হয়ে ওঠে; এবারের মতো এই বিভীষিকা কাটিয়ে ওঠা গেছে। ছাত্র সংসদের ও সাধারণভাবে কলেজের আরো কিছু ছাত্র বন্ধুর (যারা পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়) সাহায্য আমরা বন্ধুত্বের জোরেই দাবী করেছি এবং পেয়েওছি। তাদেরকে তো বটেই পত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিকাকেও প্রথাবিরোধী ধন্যবাদ জানিয়ে লজ্জায় ফেলা যাক।

পত্রিকা প্রকাশের সময়ে বন্ধু অভিজিৎ দত্তের নিঃস্বার্থ সাহায্য ও দক্ষতা সত্ত্বেও আমার অক্ষমতা হেতু পত্রিকায় যা যা ভুল ত্রুটি রয়ে গেল তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি সকলেই এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি মার্জনা করে নেবেন।

(উল্লিখিত সমীক্ষাটির নাম 'The Presidentians of Today.' ঐ সমীক্ষায় সমীক্ষা পত্র (survey form) বিলি করা ছাড়া আমি আর কোনো কাজই করিনি। সমীক্ষক হিসাবে আমার নাম বাদ দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রকৃত সমীক্ষকরা সৌজন্যবশতঃ আমার নাম বাদ দেননি। সমীক্ষাটি পরিসংখ্যানের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু সম্পাদকীয় এবং বিশ্লেষণের ধরণ আমি ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করি। সমীক্ষার জন্য সমস্ত প্রশংসাই প্রকৃত সমীক্ষকদের প্রাপ্য। সমীক্ষায় প্রকাশিত সবরকম মতামতের দায় থেকে যদি পাঠকেরা এবং প্রকৃত সমীক্ষকেরা আমাকে অব্যাহতি দেন তাহলে আমি খুবই খুশী হই। চা. নি.)

REMINISCENCES

Subodh Chandra Sen Gupta

When I joined Presidency College for the I. A. in 1920, I was a raw village boy, wide-eyed about the myths that surrounded the institution. I can still recall the awe with which I regarded my fellow students, and I remember it took me quite a while to get used to the idea that I was actually one of a coterie of brilliant students. The most potent of all my early impressions of the College was definitely the intellectual atmosphere that pervaded it, and that extended itself even to the Hindu Hostel, where I stayed. What seems striking about my memories of Presidency in the '20s is the total absence of the indiscipline that I saw when I left it, in 1960, and that is there now. Of course classes used to be held with absolute regularity ; Principal Barrow's strict orders were that if students could not manage to change classes within the given time of seven minutes, they were not to attend the next class at all. There were about a hundred students in the Arts Section of the Intermediate class, and we were meant to sit according to our roll numbers : this rule, however, was strictly maintained only in the English class. There used to be great competition among friends, and it was indeed an invigorating challenge for me to be pitted against the city boys whom I considered to be of superior intellect. My roll no. was 12, and I remember that 14 was a brilliant boy who was also my friend.

If my fellow-students were a challenge, there were some professors in the Dept. of English who were an inspiration : of course, they have beome legends now. During my first two years at Presidency College, I attended some memorable classes on Wordsworth and Tennyson, at which Prof. Srikumar Banerjee taught us, for the first time, that poetry was not a mere matter of word-meanings. I remember a friend commenting after one such class that Prof. Banerjee had made the "fees worthwhile".

I stood second in the I. A. Examination, and joined the first year B. A. Class with English Honours in 1922. Prof. P. C. Ghosh was the greatest personality around. Everyone, including the junior professors, were very afraid of him. We used to have more students than are admitted nowadays. Our batch consisted of about twenty-two to twenty-five boys. Classes used to be held in the rooms to the right of the main staircase on the first floor (not Room. 23 because it was the Head of the Department's room). I can still recall clearly the day P. C. Ghosh entered our class for the first time in July 1922, with the First Folio in his hand. What everyone talks about even today is P. C. Ghosh's excellent delivery of the texts. Srikumar Banerjee had rightly commented : "He gave to the three Aristotelian Unities the fourth Unity of Reading". But though that

was indeed memorable, we cannot forget that he was an excellent teacher too.

What one remembers about the British teachers at Presidency then is that they all seemed to be suffering from a sense of disorientation, which did not allow them to concentrate wholly on their teaching. Prof. J. W. Holme was one such instance : he was extremely thorough in his work, but what was lacking was a personal contact with his students. Of course, he helped me tremendously during tutorials. Coming from the village, I tended towards the "Gorgeous splendour' of the the language, but he soon cured me of that. If I wrote "very intelligent", he would retort, why 'very' ? Won't 'intelligent' do ?" and threaten to fine me Re 1/- everytime I did such a thing. In fact, in this connexion, I remember how amazed and impressed we were when another Englishman among the staff had asked a student for a description of a flood, and was enraged by the phrase "why not the simple Teutonic Word 'killed' " ?

Student politics during my time was limited at best ; in fact, it hardly interfered with the academic life of the college. If one talks of the politics of violence—of Aurobind, of Khudiram, of the Anushilan Samity—these did not affect Presidency then. During the Civil Disobedience and Non-Co-operation Movements, politics may have invaded the College from the outside, but the students remained largely uninvolved. There were sporadic incidents like Subhas Babu's alleged assault on Prof. Oaten. I believe that during James's time, there had been a search of the college as well. Real political involvement came later, in the early 60's, with the Naxalite Movement. By then, I had left Presidency.

As for other extra-academic activities, I cannot recall anything really impressive. The Seminar in each Department was fairly active, but then that too was essentially academic. The College Union was definitely not as important as it became later. Social life at the Hindu Hostel was interesting, and kept us engrossed.

M. A. classes at Calcutta University, I must tell you frankly, came as a very great shock to me : the standard was low, and one just never felt the urge to study in such an atmosphere. What one did, one did on one's own (in the library, usually). This is probably because the most important factor of a personal relationship between teacher and student was completely missing at this level. This contact which one establishes in College—most definitely at Presidency—is far more valuable than a string of lectures. Nowadays the staff at Calcutta University do probably better than in our time, but still nobody learns anything.

The present impasse at the University is of course a political issue, not an academic one. I think the only way to solve the problem, if one wants to improve education in Bengal, is to let every College have its own PG department.

I joined the Department of English, Presidency College, as teacher in 1929, and taught there during 1929-33, 1935-42 and 1946-60.

Over these years, I think I saw a uniformly high standrd of students in the College. In this connexion, I could quote Prof. T.N. Sen ; "60% of the students at Presidency are first-rate, and they set the standard of teaching". What was most memorable was the close personal contact that I established with my students, especially those who had tutorials with me : they became my friends. Of course, the academic life was never as disciplined as I found it in Hindu College, Delhi (where I began my teaching career) ; yet it attained rare standards of excellence. I remember a comment Miss A.G. Stock made about me and Presidency at a seminar : "Don't listen to him. He comes from Calcutta's Presidency College. Out of the one lakh students in Calcutta,

the best hundred go there ; he has read amongst them and taught amongst them. He cannot know the general standard of academics in India !" I deem it the best compliment that could have been paid to to me.

Yes, I am most depressed by what is happening in Presidency now, and its future if things continue in this way. The problem is, you know, that the present Government does not want Presidency at all. There are political issues at stake. "Elitism" is no charge at all, at least in our country, where 37% are literate. Why not call this 37% the elite ? This is a ridiculous concept : whether in America or Russia, the better students must gather at one place . It is a necssary intellectual aristocracy, and it is a because this so-called "elitism" is being undermined that Calcutta University is in such a poor shape today. There is nothing to be ashamed of in academic elitism. The fact that I hold a good academic record is something I don't need to mention today but I cannot deny that it was useful to me at one stage of life. If this is elitism, then why do they keep up the distinetion between 'First Division' & 'Second Division' ? Why do they publish 'merit lists' after the school-leaving examinations ? You can never get away from academic elitism'.

As for the future of Presidency the only way to stem the rot about to set in is to re-create the conditions that will make the best students flock here once again. The operative element should not be merely the teacher, but the good student. If this is elitism, and if equality is the goal, then excellence has to be sacrificed to it.

(An interview to Brinda Bose and Shubhabrata Bhattacharya)

Aggression, Children and Socialization

Prasanta Roy

Every community has some preferred standard of human behaviour. Children are expected to learn them. Elaborate institutional arrangements develop to help them—in a real sense, to make them learn ; so do some institutions to oversee the whole process. As it happens, some children fail to acquire the capacity for the normatively desirable form of human relations. These are cases of failure of authoritative socialization.

Among these products of marginal socialization, many are drawn from poor and lower-middle-class families. It is not that affluent parents are always competent socializers, or their children adequately conformist. But that is a different issue. Without going into details, one may mention that after all affluent people enjoy greater autonomy in re-organizing human relations while keeping the poor closeted within archaic forms. The roots of the failure of socialization in a lower class set-up lie to a significant extent in the affluence of the few.

The typical academic sociologist treats such failure as a normal incidence of pathological development. Such a view seems to be devoid not merely of values but also of the human capacity for *compassion*. Coming to policy formulators and politicians, one notes merely the loud noise they make about childhood destitution. Lest their 'concern' should be lost, they declare a particular year (1979) to be the "Year of the Child". David Kennedy (*Children*) reminds us that some one has hailed this as the "Century of the Child". Nothing happens to the vast number of the world's poor children.

One wonders why intellectuals persist in this kind of senseless endeavour. There is possibly a clue in J. D. Bernal's observation ; "Whether an age or an individual will express itself in creative thinking or in repetitive pedantry is more a matter of desire than of intellectual power . ..." (*The World, the Flesh and the Devil* : *An Inquiry into the Future of the Three Enemies of the Rational Soul.*)

One important factor responsible for marginal socialization is aggression in the immediate milieu. Many children are victims of mainly non-sexual sadism in adults, which, according to Eric Fromm (*The Anatomy of Human Destructiveness*), finds its most widespread manifestation in ill-treatment of children. The child may begin to experience this as early as at the age of one or two, the incidence doubling during the ages three to nine. There is also mental sadism expressed in a wish to humiliate and hurt children's feelings. It may take the form of a question, a confusing remark, even a smile. The power-assertive childrearing methods—yelling, shouting, verbal threats etc. as compared to the love-oriented techniques (praise,

reasoning, display of disappointment, withdrawal of affection etc.) produce an inclination towards deviant behaviour in children. Parents respond by inflicting punishment. A circular dyadic relationship emerges between parents' punishment and children's non-conformist behaviour. Thus many children are caught up in a vicious circle of aggression.

Children have one major disadvantage : they cannot retaliate. They are crippled by what Erik H. Erikson (*Children and Society*) calls "a sense of smallness", an ineradicable sense. This is true even when they witness aggression by an elder towards another elder. The injury is no less . They can do nothing about it except conjuring up fantasies.

There is sufficient evidence that lower-class adults who engender aggression towards or in the presence of children, do so because they themselves had identical experience in their childhood, and because their adult existence means exposure to various kinds of aggression from those favourably situated in the social order. These adults have no option. Their 'fortunate' counterparts can afford to use love -oriented techniques.

Thus the aggression children face is rooted in social inequality. We must contest the opinion that pathological family life is solely the result of idiosyncrasies in the parents' personalities. Human destructiveness is one of the possible answers to psychic needs rooted in the existence of man.

Hence a question : can adults under strain 'educate' their children in preferred standards of human behaviour ? Or can their children acquire such standards ? Experience suggests a negative answer. Socialization has implicit association with stability, with the goals of a collectivity, goals which have value dimensions. Aggression, fear and increasing sense of relative deprivation, which characterize lhe life-view of the majority of children, cannot be aids to the development of a stable, positive and value-oriented personality.

PRESIDENCY COLLEGE
LIBRARY, CALCUTTA

Comments on the 'Challenge of Education'

Chandreyee Niyogi

The present system of education in India is largely a carry-over from the colonial period. There have been various changes at the surface since independence, but no comprehensive National Education Policy has yet been formulated. Faced with such a state of things, we would naturally have nothing but a word of welcome for the new national education policy perspective which claims to be 'an important stage in the process of reviewing and reshaping the education system to enable it to meet the challenges of the future'. The policy perspective, however, does not clarify how it proposes to meet the challenges of the present. We would do better to wait and ask ourselves what the policy document really has to say to us before welcoming it with open arms and proceeding to build a magnificent edifice of future plans. For all we know, the base may be entirely distorted.

The planners of the document have given a lot of thought to the purpose of education and observe, as we all know, that education has the purpose of enriching the personal life of an individual as also of generating certain social values and attitudes. But 'social values and attitude' cannot be 'inculcated in our students' as abstract concepts isolated from the social reality. Inequality and communalism being two major forces shaping India's socio-political reality, 'democratic', 'secular' and 'egalitarian' values cannot be imported out of the blue while the socio-political forces continue to operate as usual. One wonders how many people know what these values actually mean. The teachers apparently do not, for the policy paper states they are yet to be 'exposed to the ideas' of these and other 'humanitarian' values. One can only hope that the teachers-trainers know what they are teaching.

So much for such an abstract purpose. The more immediate objective of the education policy is to 'induce people to plan and execute research and development activity necessary to keep India abreast of developments elsewhere in the world'. According to the document the most important challenge for the Indian economy is to adapt itself rapidly to the high technology of economically advanced countries. It is also observed that 'the dynamics of economic structure and the inclination to take up problems which would offer greater rewards in terms of recognition from an international audience is a serious constraint on the reorientation of research so that it would lend significantly greater support to solve problems of... agriculture and other activities related to rural development'. But for this single sentence the orientation of the entire paper is towards education for the purpose of helping rapid industrial development, particularly in the private

sector. In a country which is planning to move into the world of modern capital intensive technology, illiterate labour is bound to prove a liability ; and since 'the poor and the illiterate' are likely to be 'millstones around the necks of the more happily placed' people, education must be universalized upto a certain level. Let us now consider the proposals for making educational opportunities available to all the people.

The policy perspective states at the very beginning that the highest priority in terms of investment should be given to elementary education. 'Investments in elementary education yield the highest rate of return and have a significant impact on productivity and the general well being of the people'. Yet when an attentive reader goes through the document, looking at the proposed innovations in elementary schooling, adult education and vocational training he finds, to his ultimate surprise, that 'it is widely believed that the single most important indicator of a country's future is the state of its higher education'. Nehru is quoted as having said that 'if all is well with the universities, all would be well with the nation' and the highest priority is quite unequivocally awarded to post-secondary education.

Post-secondary education, however, is a very distant dream to the majority of the Indian people. The World Bank estimates that India will have the largest illiterate population in the world by 2000 A.D. In 1981, according to the policy document the literacy rate stands at 36.20. The policy document also offers a sufficiently disarming picture of the real situation of elementary education in our country. One-fifth of all habitations of more than 300 persons have no school of their own. 'Where schools exist, 40 per cent have no pucca buildings, 39.72 percent have no black-boards, and 59.50 per cent have no drinking water. 35 per cent schools have a single teacher to teach 3 or 4 different classes'. Quite an underestimate, but we also learn that 'many schools remain without any teacher for varying periods of time and some teachers are not above sub-contracting teaching work to others who are not qualified for this work either by training or by experience'. More than 90 per cent of the plan expenditure for elementary education 'is spent on teachers' salaries and administration' so that 'practically nothing is available to buy a black-board and chalks' let alone charts, other inexpensive teaching aids, or even pitchers for drinking water'. Government resources are apparently very limited, and further it is almost impossible to improve the condition of these schools because of a 'gigantic bureaucratic set-up'. 'Persons in the community with resources, knowledge and skills will have to help in setting up and managing these schools ; school children of suitable age will have to participate in community work ; .....The community will also have to assume responsibility for maintaining school buildings, and for arranging mid-day meals, uniforms...···and books etc .....' 'The community' will also be 'authorised to keep an eye on the performance of schools and specially of the teachers'.

The 'community', which appears to be so ideally suited to bear all kinds of responsibility, is evidently destined to emerge as the most powerful influence on elementary education and thus also on the entire educated population. But what, after all, is 'the community' ? The planners of the document observe that 'because of disparities in income and the large number of people living below the poverty line, it is unrealistic to expect the community to effect much improvement in the quality of schools'. Not at all. It is true that the entire community will not be able to effect anything, but the wealthy individuals or groups in the community certainly will. Big landholders and wealthy farmers in rural areas (where the agricultural

economy predominates) and private entrepreneurs in predominantly industrial regions will get the full opportunity to build up local manpower according to their needs. However much the document planners urge us to put faith in the benevolence of humankind it is impossible to imagine that this wealthy and influential class will serve the interests of the entire community rather than their own interests. If they do bring about 'a sea change' in the education system, as the planners of the document piously hope, ('provided the interests benefitting from the exercise of control from afar would loose their hold on them') the change is likely to be for the worse. Vested interests will not be working 'from afar' but from very close quarters, so that it will be impossible for the government to come to know of, let alone rectify, anything that goes amiss.

The planners of the document observe that in all democratic societies education is a fundamental right. In India, however, it is not. Education is simply a directive principle. Following this lead one can raise a very fundamental question about the nature of Indian society even according to the criteria of the ruling political party, but let us not ask such uncomfortable questions. A little more than 3 per cent of India's GNP is spent on education. While 85 to 90 per cent of this amount goes to meet salary and administrative requirements, only about 5% of the GNP is available for actual educational expenditure. Unlike the Education Commission of 1964-66. this policy document does not advocate any increase in government expenditure for education. The share of government expenditure on higher education has been increasing while the share spent on elementary education has been going down since independence. The planners of the document constantly feel resource constraints which will barely allow a model school to be set up in each district of the country but will probably not permit the government to take up programmes for improving the condition of existing schools.

It is expected that students from all levels of society, particularly those who come from rural areas, will be able to benefit from all the modern facilities to be offered in the model schools. If 'ideal' education is offered in a single institution among hundreds of other sub-standard schools, the privileged classes will be the first to make a bee-line for it. One wonders also as to what measures will be taken to ensure that students who cannot attend even an ordinary school near their homestead because of the economic and domestic pressures on them will eagerly run to the model schools. The opportunity cost of what is even 'ideal' education makes it a luxury for them. It is remarkable that while the policy document does not set any target for improving the condition of ordinary village schools, it declares with obvious pride that between 1984 and 86 nearly 2000 computers will have been distributed in schools and the 'computer literacy' programme may be expanded in the next few years.

Vocationalisation of higher secondary education was the major objective of the education policy of 1968. The new policy paper admits that the vocational stream has failed in its purpose as 'a result of the poor linkage between it and industry or opportunities for self employment'. It is now proposed that vocationalisation should be oriented towards jobs in the services sector and opportunities for self-employment. Self-employment requires capital as well as skill, and its scope is extremely limited. Jobs in the services sector, on the other hand, are not particularly abundant. How can the students undergoing vocational education be gainfully employed in the economy? The question ultimately remains unanswered. Vocational training is rated inferior to pre-professional and general academic education. The planners of the document

realise this but they cannot offer any suggestion for removing this dichotomy between academic knowledge and technical skill, simply because they are not sure that the economy will be able to absorb all or at least most of the students with vocational training. The day when vocational skills will earn almost as much as academic education (as in the advanced countries today) is much further off than they would like us to imagine.

One other radical proposal of the policy document needs mention. In popular parlance it is called 'depoliticization' of educational institutions. 'This would mean that political issues might be debated within the precincts of' institutions 'at the intellectual level' but the adminisrative system of the institution should not be used or subverted to suit the ends of any political party. One wonders why the document planners do not suggest any method for the arbitration of disputes which may arise in the process of administration. A prominent historian suggests 'the setting up of independent arbitration tribunals for settling disputes'. The 'independence' of an educationist is a matter on which political parties seldom arrive at a consensus. Besides, if the ultimate authority over universities rests with the present chancellors, it would be naive to suppose that all disputes will be settled 'independently', because the chancellors of most Indian Universities (the Prime Minister and the Governors of different states) have connections with a particular political party. Unless the chancellors are nominated by the university councils, the very first step towards 'depoliticizing' university administration will not be taken. Political activity, however, cannot be entirely eradicated from educational institutions (unless, of course, individual freedom is throttled) because true political awareness is bound to make an individual shun a passive and neutral role. The planners of the document would probably agree that even Gandhi may not have liked the students and teachers of 'depoliticized' institutions to simply debate critical issues at an intellectual level and not participate in any political movement of the time.

It is quite impossible to imagine that the planners of the document are not aware how lopsided and self-contradictory some of their proposals are. They show a lot of genuine concern for the technological aspect of higher education and research and development programmes, as the ultimate objective of all education reforms proposed in this document is to push India along the supposed course of capitalist development. All problems are therefore inevitably faced with an attitude of amelioration which will be recognised and applauded by an 'international audience' and certain sections of our own society. The new education policy is clearly not meant to benefit those who have been called the 'poor and the illiterate' beyond making them a little more useful in the process of development. The planners of the policy paper have adopted many recommendations of the Association of Indian Universities, but they probably do not think much of the near-aphorism that appears in the recommendation papers : 'No major educational reform can be implemented without a corresponding restructuring of the society which will ensure a more equitable distribution of wealth and opportunity'. Small wonder that they try to justify their apparent inability to foresee the ultimate outcome of their plans with the excuse that 'since the detailed scenario of the process of development in the coming decades is still to be spelt out, it is difficult to see its full implications with reference to educational planning'. In this word-ridden country, let not rhetoric sweep us off our feet again.

The Poetry of Thom Gunn

Suhit K. Sen

Thomson William Gunn was born in Gravesend, Kent, and brought up in the comfortable atmosphere of middle-class London life. Apart from two years of voluntary service in the army, very little disturbed the even tenor of such a life. After an undergraduate stint at Cambridge, Gunn left for the U.S.A., where he continues to live. In America Gunn found himself back in the confines of academic life. Later, for some time, he left his university job in search of a life of adventure. He has, however, returned to this familiar world. Though only about half a decade junior to the late Philip Larkin, his poetry is composed in a language that conforms to an entirely different age—the age of the Beatles, Bob Dylan and the Western drug experiment. Thus Gunn, sharing the energy, the confusions and the apparent indirection of his contemporary culture, speaks with the authentic (and perhaps the most articulate) voice of the sixties. This, however, is not to say that his poetic concerns are rooted to his times. They are ones that have plagued all those who have undertaken the task of constructing paradigms of perception in poetry through a recreation of experience, and the experience of creation.

Thom Gunn's reputation as a poet began with the publication of 'Fighting Terms'(1954). Since then his major publications have been 'The Sense of Movement' (1937), 'My Sad Captains' (1961), 'Positive' (with photographs composed by his brother Andrew Gunn, 1966), 'Touch' (1967) , 'Moly' (1971) and 'Jack Straw's Castle' (1976). Since'Jack Straw's Castle', he published no major collections.

From the uncertain and anarchic emotional force of 'Fighting Terms', Thom Gunn has emerged in later works as a more subtly philosophic and compassionate poet. In fact, Gunn's transformation offers perhaps the best example of progressive development that can be found among English poets of post-war vintage.

The development of Thom Gunn's poetry and personality is best seen in the shift of attitude that marks his approach to the fundamental problem of self-identification. This introspective project touches most of the major issues that Gunn deals with : the relationship between man and woman, the position of the individual in his ambient world, and the conflict between the somewhat fanciful possibilities of action and the well-ordered landscape of sedentary intellectual manoeuvring in which they are graphed.

In his early work Gunn constantly tries to find his place in a life of action and violence where his closest comrades are the soldiers, the street toughs and the motor cycle gang. In his first and second collections, 'Fighting Terms' and 'The Sense of Movement', this is easily discer-

nible, especially in poems like 'The Wound' and 'On the Move'. The fundamental philosophy of the early Gunn is perhaps best summed up in the last line of the poem 'On the Move' :

At worst, one is in motion ; and at best,
Reaching no absolute, in which to rest,
One is always nearer by not keeping still.

However, even in his second collection—'The Sense of Movement'—Gunn's dynamic perception is bedevilled by the first doubt. In 'Vox Humana', the brilliant concluding poem of this collection, Gunn seems to concede ground to the complexities of his quest, and the dfficulty of clear definition.

In later collections—'Moly Touch' and 'Jack Straw's Castle'—Thom Gunn elaborates on this sceptical tone. Here he does not expect to lose himself in rhythmic, unthinking monotony but rather to find himself through the mechanism of ceaseless doubting. This becomes explicit in poems like 'Confessions of a Life Artist' ('Touch') :

I think, therefore, I cannot
avoid thought of the morrow.
Outside the window, the birds
of the air and the lily
have lost themselves in action.

By this time, Gunn has tempered his earlier uncritical vindication of all men like his aforementioned comrades—who pursue the unceasingly dynamic life as an end in itself. In 'Incident on a Journey' ('Fighting terms'), Gunn finds himself at one with a soldier who 'regrets nothing' :

A red coat soldier to the mouth, who said
'I am not living, in hell's pains I ache,
But I regret nothing'
.....
Whether his words were mine or his, in dreaming
I found they were my deepest thoughts traslated
I regret nothing.

In his later poetry Thom Gunn has exorcised his fascination for the man of violence. He brings to such characters a critical insight that is all the more sensitive because it is enlightened by sympathy and compassion. In 'Innocence' ('My sad Captains') he says :

He ran the course and as he ran he grew
And smelt his fragrance in the fields. Already,
Running he knew the most he ever knew,
The egotism of a healthly body.
. . . . . .
When he stood near the Russian Partisan
Being burnt alive he therefore could behold
The rib wear gently through the darkening skin
And sicken only at the Northern cold.

In this later phase we see Thom Gunn engaged in a more rewarding quest. It is then that he penetrates, at times falteringly but with sincerity and honesty, the predicament to which he is subject. For Thom Gunn realises that his search is not merely an individual odyssey but has a wider significance. By this time, threfore, Gunn breaks out of his restrictive and inhibitive shell and begins to take note of the realities that govern mortal life. Thus while the early Gunn seems to take the existence of uninfluenced choices for granted, the later Gunn concedes that for a great number there are really few choices. The protagonist of the poem 'Sparrow' ('Jack Straw's Castle) is one such character. The most explicit statement in this regard can be found in the poem 'Dolly' ('Jack Straw's Castle'), where he says :

..... they loll
blank stomachs depending from blank heads
with no freedom,
ever, ever,
and in need.

The question of personal choice, once indiscriminate energy has been precluded, continues to trouble Gunn. It is this theme that constitutes the subject of some of his poems, especially in the collection 'My Sad

Captains'—and for sheer poetic brilliance, the poem of that same name will find few rivals. With maturity, Gunn, like his senior contemporary Larkin, has been confronted with the problems of interpersonal relationships. In early poetry his stands seems to be either of withdrawal or hostility, as in 'Tamer and Hawk' ('Fighting Terms'). But later Gunn's attitude both deepens and softens. In 'The Outdoor Concert' Gunn discovers that :

The secret
is still the secret
is not a proposition :
its in finding
what connects the man
with the mystic, with
the listeners.
.....
and then in living a while
at the luminous intersection.

And in the poem "Touch", finds the
.....dark
wide realm where we
walk with everyone.

In fact, Gunn consciously recognises his earlier attitude to be something in the nature of a blind alley. His callous disregard for those who are the subjects of his 'sullen art' forces apologetic words from him. Thus in 'Confessions of a Life Artist' and 'The Roadmap' he admits :

And wreckages of trust litter the route
each an offence against me.
I gaze back
in hardened innocence ('Roadmap')

One critic has suggested that Thom Gunn's early use of the violent idiom is only an externalisation of the turbulance that afflicts his sheltered psyche. Seen in this perspective, the poem 'The Wound' can be said to concern not an actual headwound but rather the laceration of Gunn's sensibilities. In this context then, Gunn's later maturity is, arguably, evidence of alleviation of this mental and spiritual laceration.

It is probably still too early to speak without equivocation of the final direction of Gunn's poetry. But there are ample indications that he may find himself in a situation where his scepticism may turn into the acceptance of a desperate futility. If Thom Gunn has discovered his place in the universe, it is through the realisation that his ego does not amount to much. Thus in the brilliant if somewhat abstruse poem 'Jack Straw's Castle' he says :

I burn out
so heavy
I sink into
darkness into
my foundations.

This darkness seems to colour his entire perception of the world, and so in the same piece :

And her eyes
.....
has beheld
the source of everything and found it
the same as nothing.

In an even earlier poem 'Confessions.....' ('Touch') he strikes the same fatalistic note.

Later the solar system
will flare up and fall into
space, irretrievably lost.

While Gunn's poetry continues to evolve, it must remain, in some measure, an enigmatic quantity to the poet himself, as much as to us. But by now it is well beyond doubt that he has secured for himself a permanent niche in modern English poetry, notwithstanding the fact that he has not received as many critical accolades, or as much public acclaim as his contemporary, the present poet Laureate of Britain. Ted Hughes.

STILL THE DECEMBER SKY

Sudipto Sen

The december sky descends at night
when we are not particularly watching.
watches with deep dissolving eyes
as of old ; waiting for a distant day
to open between the restless lids of
the passing night. We are alone—
buried in the warmth of the old bed,
as the last headlight crawls away
over the forlorn walls, as the last
ship bellows from her harbour
beyond the cosy kitchen sounds.
Like children is this quiet presence
we are safe in the known darkness.
Across the window the december sky
between the silent lids of the night
still expect a day before cups, desks
movies and books : each night disfigured
by time, obscured by a different dream.

Notes From An Indian Jungle

Kinsuk Mitra

We are in an Indian jungle. Our tent is pitched under the giant Sal tree overlooking the course of a small stream which has dried up. The scorching sun has dipped into the western horizon an hour or so earlier and we can distinctly feel the drop in temperature. In fact it is going to be quite chilly as the evening progresses, but the pile of firewood that lies beside the tent will carry us through till dinner.

Since you are curious about how the forest feels after dark, I will take you for a few hours' walk down the jungle trails surrounding my camp. But before that let's settle down for an hour or two beside a comfortable wood fire. I avoid lighting a fire close to my nylon tent, but the dry bed of the nullah in front provides an excellent site for it. My friend Omar who lives in the nearby village will soon bring us a can full of mohwa. It is a mildly intoxicating health drink of this area. Freshly prepared from the fruit of the mohwa tree which you find abundantly around here, it tastes fresh and carries a beautiful scent of the mohwa fruit.

Omar arrives dutifully with the can ; but he informs me that he has seen a herd of elephants coming towards his cornfield, and unless he manages to frighten them away, they will leave nothing of his crops. I give him a few crackers which I always keep with me--to be used if elephants come too near my tent.

It feels good to sit beside a fire in solitude and listen to the distant calls of the jungle dwellers. By the way, I haven't acquainted you with the familiar calls we will often be hearing throughout the week you are going to stay with me. The metallic 'Aiow' we had been hearing at dusk had come from the Peafowl. And the soft 'Co-o' we just heard was made by the Chital or Spotted Deer. The 'Chuk-Chuk-Chuk-Chukrrr' coming from the ground is the call of a dark grey bird, the Longtailed Nightjar. Can you hear the 'Piu-Piu-Piu-Piutuk-Piutuk' ? It is the commonest call you will hear---that of a Jungle Owlet. It is basically nocturnal, but one does hear it during the day as well.

I can see that you are getting restless to venture into the forest. Let's finish our dinner and get ready. You must wear dark clothes all over so that you are absolutely inconspicuous in the dark. My dark green bushcoat is tailor-made for the jungle, and you must wear something similar.

We finish our dinner and extinguish the fire. The weather is dry and forest fires are common during this period. We must take all precautions to prevent them. And now we move, with flashlight in hand. The hillock we are ascending is rocky and I have often come across leopards sun-bathing on these rocks. We move slowly, holding our breath, for we are out on a pleasure walk and are in no hurry.

As we move forward, the faint thud of a stone somewhere at the base of the hillock attracts our attention. Such a noise is not expected from a deer, for it will be too afraid. A tiger or a leopard is not so clumsy and moreover, it will never advertise its presence. We crouch behind a four-feet-high rock to conceal ourselves and wait for the animal to come up the path. For the next five minutes we are absolutely silent and motionless, and no other animal seems to be around. You are feeling impatient, and as you raise your right hand to slap at a mosquito, I squeeze your left hand, for I can hear the sound of laboured breathing, as if a tired man is finding it difficult to climb the hillock. You too can hear the breathing as it draws nearer, and soon a huge sloth bear can be seen walking up the path.

I squeeze your hand very tightly, and you understand that we must be absolutely silent and motionless. The sloth bear is very short-sighted and deaf. It senses danger at the very last moment and when it does, it charges blindly. A bear mainly eats fruits and insects. It must have moved the stone we had heard falling to look for beetles and other insects which hide under stones. We wait for some time till the bear is half a mile away without realising that it had been watched from such close quarters.

As we are about to get up we hear a crack. We sit in silent excitement. This time the bushes part and a huge sambar stag nervously shows itself. Sambars are the largest of the Indian deer, and this one is a mature stag with decorative symmetrical antlers. It is dark brown in colour and we can hardly make out its shape in the dim light of the stars.

The sambar is quite unaware of our presence and as it comes right in front of our rock, I decided to try out an experiment which I had learned from an expert naturalist. Picking up a thin branch that had been lying beside me, I protrude one end above the rock. The sambar spots it instantly with its ever-watchful eyes, and halts. Then I slowly start revolving the branch. The deer is puzzled and we can make that out from his jerky movements and stamping of feet. Deer are so full of inquisitiveness that even though they understand that there is something abnormal around them they wait to find out more about it. Taking this oppurtunity, the predators find it easier to catch them, while a poacher gets a sure shot at such a pointblank range. At present we are unarmed, and you are thinking of a flash photograph as the sambar is approaching closer to investigate the source of this rotating branch. You try to open your lens cover but you make a distinct sound in the process. We hear a sudden 'Dhank' as the sambar calls in alarm and dashes down the hillock at a terrifying speed. You look nervously at me, but there is nothing to worry about. You did scare the deer away, but this is our first experience and you will learn a lot from this.

The alarm call of the sambar has warned all the jungle folk that there is danger lying up here, and chances of more animals coming this way are slight. I will take you to a grassland nearby where chances of sighting animals are better. You must walk very carefully and look at the ground before you step. Firstly, during this season, snakes are frequently about and secondly, we should not advertise our presence, which might scare away animals.

We move on silently down the forest path for a quarter of an hour, and then just as we turn a blind corner, our flashlight picks up the figure of a huge bull elephant standing alone in the middle of the path. It looks pitch black and has one large tusk. The other tusk the local people say was broken during a nightlong fight it once had with a younger male. This elephant is seldom encountered in this area, for

it leads a solo existence and spends most of its time feeding deeper in the forest.

The elephant is distinctly annoyed at being disturbed, as is evident from its posture and its outstretched ears, Blinded by two flashlights directed towards its eyes, it is trying to identify the intruder by scent. The swaying of his extended trunk, which is a sensitive sensor, suggests this. If this elephant in a bad mood gathers the courage to charge at us, we will be in a tight position. But as is evident from its next action, this bull is a coward. We hear a shrill grunt as the elephant turns and gallops away silently into the darkness.

It is beyond anybody's imagination that a huge creature like an elephant can run down the forest without making any sound. You are still standing at the same spot and your flashlight has not moved a bit. I can make out that you are thrilled and can hardly believe your eyes. It is truly a wonderful spectacle to see a solitary bull elephant in this way, but we should have been more careful. Had it been bold enough to charge at us, we hardly had any escape routes.

But now we must not proceed towards the elephant any more. Instead, I will take you down a shorter route to the grassland. The moon is just rising in the eastern sky, and visibility will soon improve. The grassland will look like a natural carpet bathed in the soft moonlight. We have almost reached the grassland now. Very stealthily we cross the last layer of trees, and just beside the grass, there is a sudden movement. Before we can look at the tiny aimal that caused it, it jumps into the grass and is gone. You tell me that it is Common Hare which is often seen around my campsite. But my observation is different. The Common Hare, on being disturbed, rushes down the road for a while and halts to turn back, to see what's up. Then it runs for a while and halts again. Finally it moves into the forest. But this one behaved differently. I have noted this difference a number of times and I suspect that this one is a Hispid Hare, which was believed to be extinct and was rediscovered recently. Whatever it might have been, we hardly saw it, and one should not leap to conclusions.

The moon is up now, and this is the time to go and visit the machan I have built on a palas tree, just beside a path separating the grassland from the tall forest. We take half an hour to reach there and as we approach the water-hole in front of the machan, a beautiful sight awaits us : a herd of spotted deer drinking. There is only one mature stag in the herd, whom we can make out from his decorative antlers. These spotted deer are most commonly seen in these forests, and I personally feel that they are the best-looking of all deer.

During the day, the langurs spend their time on an adjacent mohwa tree, eating the juicy fruits and these spotted deer are usually found here eating the fruits dropped by the langurs. The deer are here after dark also, attracted by the block of salt I have tied round the bark of a tree for them to lick. These deer are very timid creatures, and by the time we are nearing the machan, all of them have moved away. We will not sit up in the machan tonight, for it is too late. If you are interested, and I am sure you are, we will come here in the afternoon tomorrow and spend the evening and night on top. At this season of the year water is scarce. This patch is the only one within a wide radius and, therefore we can expect to see various nocturnal animals tomorrow.

We switch off our flashlights while walking back to camp, for the moon is high up in the sky. The silence and peace of the forest fills my mind with joy, as I am convinced that after this night-walk you are in love with nature.

Thy Will Be Done : A Story of Action.

Heinrich Boll

Translated by Srimati Basu

One of my most remarkable experiences has been that of working at Alfred Wunsiedel's factory. I am naturally more inclined to reflection and inactivity than to work, but am often forced by financial embarrassments-since reflection is just as lucrative as inactivity—to take up a job. This time, having struck financial depths again, I sought the help of my old employment agency, and was directed to Wunsiedel's factory with seven other fellow-sufferers. There was to be a pre-employment test for all of us.

A glimpse of the factory was enough to make one suspicious : the building was entirely constructed of glass bricks, and my dislike of bright buildings and bright spaces is almost as great as my dislike of work. I was even more suspicious as breakfast was immediately served in the bright, gaily-painted canteen ; attractive waitresses brought eggs, coffee and toast ; there was orange juice in sleek carafes, and goldfish with blase expressions pressed themselves against the walls of bright green aquarium. The waitresses were so happy they were almost bursting with joy. Only a strong will-power—it seemed to me then—kept them from trilling aloud : they appeared as full of unsung melodies as hens with unlaid eggs. I preceived at once what my fellow-sufferers did not appear to have marked, that this breakfast was part of the test. So I began chewing with deliberation, consciously, as a man aware of the nutritive elements consumed by his body. I even did something that no power in the world would have forced me to normally : drank orange juice on an empty stomach, left one egg and most of the toast lying on my plate, refused coffee, stood up and strode around the canteen looking over-eager to begin work.

Thus I was the first to be called to the examination hall, where question-papers were laid ready on gleaming tables. The walls were the shade of green which interior-decoration fanaties fondly call "charming". Nobody could be seen, but I was so certain of being observed that I had to behave as every efficient go-getter should behave when he believes himself unobserved. I ripped my fountain-pen from my pocket impatiently, unscrewed it, sat myself at the nearest table and pulled the question-paper towards me like a choleric man snatching up a restaurant bill.

Question One : Do you believe that people should have only two arms, two legs, eyes and ears ?

Here, for the first time, I reaped the benefits of my reflectiveness and wrote without hesitation : "Not even four arms or legs are enough for my urge to work. Man's physical endowments are indeed unfortunate."

Question Two : How many telephones can you handle simultaneously ?

The answer was once again as simple as the solution to a linear equation. "When there are only seven telephones," I wrote, "I feel restless, and can utilise my capacity for work

fully when there are at least nine telephones."

What do you do after work ?

My answer : "I have forgotten what the expression 'After work' used to mean. I struck it off my vocabulary on my fifteenth birthday, because work came first." I got the job. In fact, my capacity was not fully utilised by nine telephones. I needed only to speak into the receiver "Look into it immediately" or "Do something—something should be done—something must be done—something has been done". But most of all, I used the imperative form, because it seemed to suit the atmosphere.

The lunch-breaks were entertaining. We sat in the canteen, in an atmosphere humming with happiness, and ate vitamin-rich food. Wunsiedel's factory swarmed with people who were crazy about telling you their life-stories, as all efficient go-getters love to do. Their life-stories are far more important to them than their lives ; one needs only to press a knob, as it were, and they break out in all honesty.

The sales-manager at Wunsiedel was a man called Broschek, who had brought glory on himself by supporting seven children and a lame wife in his student days through working at night, simultaneously running four flourishing commercial agencies and taking two public examinations within two years with First Class marks in each. In reply to a reporter's question, "But when do you sleep, Mr. Broschek ?", he had snapped : "To sleep is to sin."

Wunsiedel's secretary had supported a lame husband and four children by knitting, taken degrees in Psychology and Home Science at the same time, and also bred sheep-dogs and gained fame as the cabaret singer 'Vamp Four'.

Wunsiedel himself was one of those people who are ready for decisive action before they are properly awake in the morning. "I must act," they say to themselves as they belt the bath-robe firmly. "I must act." they say to themselves as they shave and look triumphantly at the bits of shaved-off hair that stick to the razor with dried lather : these symbols of depilation are the first sacrifices to their ambitious energy. Even the more intimate activities cause them satisfaction : water flows, paper is used. Something is done. Toast is chewed, the top is struck off the egg.

Wunsiedel could make every unimportant task look like an action : the way he put on his hat, the way he bubbled with energy as he buttoned his overcoat, the kiss he gave his wife, everything was action.

As he entered the office, he would greet his secretaries, "Something must be done" ; and they chorused back happily, "Something will be done." Then Wunsiedel visited every department and called out his gay greeting, "Something must be done." Everyone replied, "Something will be done." Even I responded similarly when he entered my room ; I smiled radiantly, "Something will be done."

I increased the number of telephones on my desk to eleven within the first week, then to thirteen in the second week. Every morning, I entertained myself on the tram by thinking up new Imperative forms or by conjugating the verb "to do" in the various tenses and genders, even applying the Subjunctive and Indicative forms. Once I continued to use a single sentence for two whole days because I found it fascinating ; "Something ought to have been done", then another for two more days, "One should not have permitted this to be done."

Thus, as I began to utilise my capacity for work, something was indeed done, something important happened. Early one Tuesday morning, when I had not even settled down properly, Wunsiedel rushed into my room and shouted "Something must be done." An inexplicable air about him made me refrain from giving the chirpy, ordained answer "Something will be done." I must have hesitated too

long, because Wunsiedel, who only very seldom got angry, barked roughly, "Reply at once! Reply as you are supposed to!" I replied as slowly and as defiantly as a child who is forced to speak ; I was an angry child then. I forced myself to bring out the difficult words "Something will be done", and I had hardly finished speaking before something did happen, my will was done. Wunsiedel tumbled to the floor, rolled around in pain a few times, and then lay obliquely across the open door. I knew at once, though I sought confirmation by rising from my table and walking slowly towards the body on the floor, he was dead.

Shaking my head regretfully, I stepped over Wunsiedel, crossed the corridor slowly to Broschek's room and entered without knocking. Broschek sat at a desk, held one telephone receiver in each hand, had a fountain-pen in his mouth so that he could transcribe in shorthand on a note-pad, and was working a knitting machine with his feet—this was how he stocked the family wardrobe. "Something has happened" I said softly to him. Broschek spat out the fountain-pen, laid both receivers on their cradles and carefully extricated his toes from the knitting machine.

"But what has happened ? What is done ?" he asked.

"Mr. Wunsiedel is dead," I told him.

"No," he said.

"But yes," I said, "Come with me."

"No," Broschek muttered. "It is impossible". But he hoisted up his trousers and followed me across the corridor.

"No", he said, as we stood in front of Wunsiedel's corpse. "No, no"—I did not contradict him.

I turned Wunsiedel on his back with great care, pressed his eyes shut, and observed him reflectively.

I almost felt tenderness for him, and it was clear to me for the first time that I had never hated him. There was an expression on his face like that of a child who obstinately refuses to believe in Father Christmas, though his friends' arguments to the contrary sound so convincing.

"No," Broschek said, "No."

"Something must be done," I said softly to him.

"Yes," Broschek said, "Something must be done."

Something was done : Wunsiedel was buried and I was chosen to walk behind the hearse with a large bouquet of white roses, because I am not only gifted with a preference for reflection and inactivity, but also with the expression and build that goes excellently with black clothes. I must have looked grand, walking behind Wunsiedel's hearse with an elegant bouquet of white roses. dressed in black. Immediately afterwards, I received an offer from a chic funeral parlour to take up the post of an official mourner. "You are a born mourner," the manager of the parlour said. "Your wardrobe will be bought for you. But your face is, quite simply, ideal."

I told Broschek that I was resigning because I did not feel that my potential was being fully utilised at the factory, because a large portion of my ability went fallow in spite of the thirteen telephones. And I knew immediately after my first professional funeral procession : You belong here, this is the place that was meant for you.

I place myself behind the coffin in the band of mourners with a reflective air. I have a sleek bouquet in my hand, and Handel's "Largo" plays in the background, a piece which I feel is seldom given due importance. My base is the cemetery cafe, where I sit in between my spells of work, but sometimes I also walk behind hearses that my funeral parlour does not serve, spend my own money on a bouquet, and join the welfare officers who trail behind the coffin of a refugee from the world. I often visit Wunsiedel's grave too, because I am endlessly thankful to him for having helped me discover my profession, where a reflective air is a necessity and inactivity a welcome duty.

I realised much later that I had never bothered to find out what Wunsiedel's factory produced. It might well have been soap.

THE PEBBLE

Udayan Mitra

There were three of them, all black and dirty. Their bodies gleaned with sweat. The elder boy wore a yellowed pair of loose white shorts, the girl a tattered frock of greenish hue, the original colour of which was impossible to guess. The child was absolutely naked ; there were no string marks on his belly to signify that he ever wore anything. He could not be above three– he toddled rather precariously in his walk. Short and stocky, he had a round face with two dark beady eyes shining in expectancy, and moved with the air of an inquisitive kitten who is out to explore the world. He wore a deceptive chubby look. Like the others, he never knew hunger– only a hollow feeling inside him where his guts were.

He cocked his head and blinked up at his brother and sister. They were playing a seemingly obscure game very seriously. It had something to do with a bit of string, but what he couldn't quite figure out. Still, he felt like touching the string. He raised his arms, but it was far out of his reach. The others paid him no attention. To show his enthusiasm, he ran around them–twice, thrice—on his short stubby legs—but failed to attract their attention. He dared not touch them when they were in motion, they were so big...Trying to raise himself on his toes, he upset his balance—and tumbled down. With a cry, he fell flat. His belly took the fall—he blinked from the suddenness of it, lying face down on the hard place where the concrete had solidified over the grass, killing all life. He opened his mouth to cry ; a loud harsh noise came out, seeming unfamiliar to him in its passion. They glanced at him, then went on with their game. They were too busy playing the game.

He gulped down the lump in his throat, but the pain behind his eyeballs wouldn't go. But he stopped his wails soon, because he was out of breath from trying to outshout the demonic commotion of the machines churning out concrete. He sat up and sulked. But when the others paid him no heed, he wiped away his tears with the back of his hand and scrambled to his feet. Now there was more grime than ever on his face : there was mud on his knees. The tears had left a clean streak on his cheeks. He wandered off uncertainly in the direction of the makeshift hut. It was shadowy inside. Dusty rugs lay scattered over the floor. Some of the straw had come loose from the roof and was hanging inside. He tried to pull at it, but couldn't reach it. The bricks, loosely arranged to form the walls, looked bright and red, with bits of green showing through the gaps from outside. It was dark and calm in here, cut off from the activity outside. The loud noise of construction going on outside, of labourers talking, of the supervisor shouting instructions, of concrete avalanching down on iron rods, was all smothered—made to seem far away. He tottered ahead. The aluminium pots and pans, blackened with soot and dented all over, lay uncleaned, the dried remains of the last night's meal sticking to them like glue. He turned around slowly, the small hut suddenly seeming immense in its emptiness. The broken earthenware dish only half covered the earthenware water jug. He went and peered at the black water. The light

coming through the half-open mouth made a lighted crescent in the mysterious dark water. He was afraid.

He came outside on uncertain feet. the sunshine reassured him somewhat. The other two were some distance away, quarrelling. He moved towards the construction site, ignoring the bustle and activity going on at a distance, his eyes on the inviting pile of yellow sand.

There were some pebbles lying about. He squatted to study them, picking them up one by one with his stubby fingers. There was one– a large one—with something like a face on it from the cracks. He turned it over in his small palm and looked at it again and again. He closed his tiny fist on it, barely able to enclose it. It felt smooth and cold. He felt a sudden rush of joy. It was his. He wanted to treasure it, to come back to look at it ; but he had nowhere to keep it in.

Something made him think of comfortable, warm, reassuring arms and a soft, cushion-like bosom.

"Ma ...?" he said, not loudly, a little uncertainly. No response came.

"Maa..." he said, louder, the sound of his own voice driving him to urgency.

Suddenly, the fear and terror that lay dormant gripped him. He felt desolate, abandoned, wretched. He wanted his mother. He ran about in panic and yelled, his cry rising to a frenzy.

"Maaa—Maaa—"

He ran—but there was only the earth and the grass and the massive skeleton of the construction site.

Now he howled openly. He didn't care who heard him. He shrieked in agony. "mnaaaaaa..."

The shriek brought them.

"Ma out," the boy said, briefly, decisively. The child only yelled more

"Stop crying," the girl said, "she out."

Being spoken to, his grief intensified. His eyes welled up with tears at the hint of sympathy and attention. He rolled over and over on the ground, writhing in self-pity and sobbing.

"Hungry, he is," the girl said tonelessly.

The boy went to the hut and had a look. On the way out, he noticed the pebble that the child had thrown aside in anger. He picked it up to inspect it.

"N...no no," the child yelled, suddenly aware. He lunged at the boy, but he couldn't even reach to his waist. He flayed his arms about wildly, stamped his foot, and howled uncontrollably.

The boy held the pebble higher instinctively. The child screamed. The girl joined in the game. The boy passed the pebble to her.

The child, seeming to acquire superhuman strength, rushed at the girl and pulled at her leg. He brushed off the boy's restraining hand on his shoulder, sobbing incoherent words, grieving for his lost treasure.

The mother returned from work, all sweaty, thinking of the meal she must quickly cook and eat before reporting back to the construction site in an hour. Heading straight for the hut, she picked the child up in her arms automatically, with a word of admonition to the other two. Slowly, his sobs subsided. He buried his face in her bony shoulder. And he forgot about the pebble.

And no one knew where the pebble was discarded, when it was forgotten, how it was mixed up with a hundred other pebbles, and lost into anonymity.

Till much later, many years from then, when the chasm of emptiness surfaced from the now-grown child's subconscious in a vivid nameless nightmare, making him understand that he had lost his pebble for ever, been deprived of pursuing its wonder in innocent joy, and, in forgetting his loss, had chosen for himself lifelong pain and depravity.

And he wept in unknown distress and fury.

RESIDENCY COLLEGE

WUI (Westernised Urban Intellectuals)

Kaushik Nag

'Life is an absurd habit'——Albert Camus.

—Arre dada, why have you got the coolers on ?
—I got the bloody J. B. s (JAI BANGLA) man.
—Man have you heard this latest 'wham' album ? It's real cool.
—I don't get hassled with this latest punk stuff, boss. Too much metal zapps me off.

They sit in the corner, gossiping and sipping tea. Some are high, having carefully smoked a dose of hash—smug at being able to elude the roving public eye. The colourful posters on the plastered walls grin on them with apocalyptic foreboding. But there are oh so many chasms in their lives. And they do not know how to fill the empty spaces.

A gap is really wide—wider than anyone can imagine—and it is getting bigger every. minute. A language gap. A few bearded quasi-intellectuals begin to discuss the tyranny of a political being. All in a strange language.

Some functionary or other is getting on their nerves.
—Who the hell is this man ?
—Well, don't you know him ? The bum who doesn't do no work.
—Why don't you guys go and complain to the princi ?
—We are planning a demo in the princi's room. Why don't you people come along ?
—But I got some work to do. And I tell ya I really don't believe in those demos and hanging posters on the walls and yelling yourself hoarse. It looks so silly and political.
—So what do you wanna do, hang around with the chicks the whole day in the canteen. talk shit and let the bastard get away ?
—Peace, boss, I don't want to argue any more.

So on it goes. Bigger issues and greater gaps. The South African regime can hang the blacks twice over, people can die all they want in Bhopal, the university can go kaput...
—What the hell can we do about it ? Ok, we'll donate some dough, but you don't want us to be serious about all that, do you ? And we hate politics.
—Sorry boss, that's all for today. I've got to go. Sunita's calling me.

Sometimes the conversation shifts to a graver matter. Relationships.
—Our relations with the girls was not that kind of a superficial one. It was so uninhibited. It was really like we were sexless you know. We joked, we played, we used the most decent abusive words possible but we never talked about one thing. Love.
—Love is real cheap. That's something only those unsmart 'Bong' types want — go about with arms around each other to stupid sentimental places like the Vic (Victoria Memorial) or the Princep. What bullshit they talk. Just like those Mills & Boon books.
—What happened at the IIT springfest then ?
—Aw that—that was... ..Well we were a little high with booze you know.....believe me, we just looked for platonic solitude and it was beautiful and.....Well.....

When they break down your disguise with a question in their eyes you hide hide hide behind petrified eyes.

There is no dark side of the moon really. In fact it is all dark.

The Eden Hindu Hostel : A Sardonic Celebration

Udayan Majumdar

Visit this 'Khandahar' in the early morning and you'll believe yourself to be in the land of the lotus eaters ! A swollen-eyed boy brushing his teeth might welcome you with an inquiring look, but otherwise you could pass from one ward to another, un-noticed. 'Are these students ?' you ask. And an emphatic 'yes' is the answer. Come here at midnight. No somnambulists, but boys bent on their books, hunched up in the corners of the vast rooms, meet your eyes. 'Queer' you may say, but this is as it is.

The sun does not rise here, it only sets. Or even if it does rise, the Gothic structure admits no light. Bulbs burn all twenty-four hours, and in the summer D.C. fans compete creakingly. But there is a green enclosure within this hostel —Eden, perhaps. Bathed with sunlight, noisy with crowing crows, fanned by palm leaves and dotted with green grass, it is in complete antithesis to the interior. Sit there on a full-moon night. If it is in summer, a breeze is sure to cool you, and you can lie down, looking at the bright disc though the dark leaves of the surrounding trees.

But let us assume you are a man more interested in facts and figures. Well, the hostel has approximately two hundred boarders. Undergraduate students of Presidency, Maulana Azad, Goenka and Sanskrit Colleges are accommodated here, along with some P.G. students doing their Master's degree through Presidency. The students run the mess, and the one time ward-boys have now got converted into canteen boys. The quality of the food is pardonable. For entertainment there is the 'Eden', a now broken T.T. board, and a colour T.V. Footballs, Volley-balls and Cricket sets present themselves at the appropriate seasons, and there is rarely a dearth of enthusiasts. And of course, there are two libraries as well : one the story-book library, and the other the text-book library.

But the main activity, and in a sense the activity of perennial interest, is 'adda'. From politics to film stars—well, that's not really making the extremes, for the two seem to coincide rather often. Let us say, then, from politics to the weather, there is no scarcity of topics. You'll find boys thinking about the nations, about Marxism, about religion, and about cirrus clouds. 'Is it healthy?' you may ask. And again an emphatic 'yes' is the answer. Thought is the mother of action.

However, the proverb does not apply as far as solutions to the current and recurrent problems of the hostel are concern. The hostel is 'super-less'. The Assistant Superintendent is too busy gauging the extent of the damage. And the students have become too realistic to approach anyone. 'The building is to be condemned in a few months,' you say. 'What of that ?' Is the philosophical rejoinder. You feel as shaken as the foundation itself.

Boys bathe in the verandahs, for there are no bathrooms, 'Uncivilised,' you say. 'What of that?' comes the reply once again.

Now let us assume you read Dinkaal, and secretly love gathering rumours about the hostel. Perhaps you are expecting a retaliation in this write-up. But you'll have to direct your queries to a person more interested in facts and figures.

The 'Khandahar' has a brilliant past and a good present, as far as its students are concerned. But since the argument goes "No students, no Khandahar", the future is bleak. Change it, if you dare, but do not ruin its present with false alarms.

Perhaps, when you visit this place for the first time, you have a repellent feeling. Pigeons ...bats too perhaps...flutter to announce your entry. The high ceiling, the thick walls, the long corridors create a feeling of antiquity, and you feel a fish out of water. If you retrace your steps, you miss something. But come here, live here for a few days and you'll fall in love with the place. Tucked away between Chittaranjan Avenue and College St. this place has somehow managed to maintain an all-pervasive silence. You turn introspective, your heart expands. No wonder we have many budding poets here. If you meet a lonely boy with dishevelled hair, staring blankly at the reflected sky in the College Square tank after midnight, be sure he is a Hindu hostel boarder.

So if ever you have dreamt of retracing the flow of time, if ever you have yearned to escape the claustrophobic feeling of city life, if ever you have wanted to meet some people who are almost exactly like you, step in here. We have been waiting for you.

The Street Where We Live

It has become customary to heap criticism on both students and teachers for the decline of education and of this College in particular. That we are alive to our faults may be obvious from other articles in this magazine. Here, may we make the humble riposte that society and the government give us a practical proof of their own goodwill ?

We are not about to raise issues of finance, planning or administration. This is a mundane, unacademic plea for a decent physical environment. The college building is at long last being given a face-lift. All the more reason why the street on which it stands should be rescued from its present squalor and neglect. It cannot be helped that College Street is narrow, and its junction with Mahatma Gandhi Road congested. But we may rightfully demand proper maintenance, clear pavements and efficient traffic control.

From Mahatma Gandhi Road to Surya Sen Street, College Street is like a long narrow trough with the main gate of Presidency College at its lowest point. (Calcutta Tramways has thoughtfully marked the spot with a length of particularly wretched, cobbled track.) Even a moderate shower leaves a foot of water at our gate. Heavy rain not only bars all access but climbs above plinth level and destroys books in our library. It has been reported that the drains cannot be cleared because illegal pavement stalls stand in the way. If this is true, are the guardians of the city so helpless to preserve the city's oldest and best-known college ? More ambitiously, must College Street remain outside the purview of the CMDA's drainage schemes ?

Let us next take a closer look at the pavement stalls. Only an insane optimist would hope for their removal from any street in Calcutta, and the scholarly second-hand bookshops along the college wall are an institution in their own right. But even these have recently created a new impediment by setting up unnecessary counters blocking an extra three feet of the pavement. And there can be no defence for the jerrybuilt stalls across the road, which earn their profits chiefly by illegal trading in government textbooks. They pester passers-by for custom, and blockthe entry to the actual bookshops beyond them. They set up awnings which force tall men to stoop and make it impossible to carry an umbrella when it rains. Indeed, they leave no alternative for pedestrians but to walk down the carriageway.

At least one stall has recently appeared facing the carriageway on College Street, and encroaching upon it. There are many such on Mahatma Gandhi Road. Across the junction, the northern part of College Street virtually has no pavements left to walk on, and people sell clothes on the carriageway where College Row joins College Street.

Is there any reason why the area should be usurped in this way by any man who chooses to dump a basket of wares on the road until legitimate users feel they exist on sufferance ? What became of the rule that no stalls would be allowed within 100 feet of major crossings, or upon carriageways ? We are fast reaching a point where vendors will take over the entire width of the roads, leaving only the tram tracks clear.

It may also be insane, in Calcutta, to dream of complaining about transport and traffic control. But we may point out that College Street remains the only important centre in Calcutta which is not the terminus of even a single bus route. Links with South Calcutta are specially miserable, with only a few state bus routes on which services have dwindled to non-existence. As the CSTC has patently abdicated all its responsibilities, could we have a few private bus routes to the south ? Delhi has special University bus services. It would, of course, be foolish and obstreperous of us to demand anything simllar here.

A sophisticated set of traffic lights have been installed at the College Street crossing. They prove totally unworkable at such a narrow intersection. and the constables on duty invariably contradict the lights with their hand-signals. The utter chaos that prevails at the crossing slows down the traffic to a tenth of its potential speed. A disgraceful mix-up occurs almost daily between 11 a. m. and 12 noon, even, when the roads beyond are clear on all sides.

Is it too much to expect that, if only now and then, the traffic police will make buses stop where they should and nowhere else ? Or enforce the current rules about trucks and handcarts on College Street and Mahatma Gandhi Road ? Or be a little less indulgent towards the shuttle taxis that ply a brisk trade to Howrah Staion ? Occasionally, o man in white stands at the crossing of College Street and Shyamacharan De Street, opposite the college gate. Usually, he sits on a stallholder's stool—in the shade in summer, in the sun in winter, or inside a shop when it rains. Meanwhile Shyamacharan De Street and Rishi Bankim Street are choked with stallholders' counters, piles of drying books and badly parked cars and scooters, annulling what might have been a useful bypass avoiding the College Street crossing.

In a word, the authorities seem virtually to have disowned the College Street area with respect to civic maintenance, traffic and transport : it is one of the seediest and most chaotic parts of the city. Perhaps they feel it is not worth taking pains over a place that troops of students are sure to befoul. But on the latter's part, it is an irritating and depressing experience to traverse this area every day. Is it any wonder if this alone imparts an unkempt, haphazard quality to the academic atmosphere ? Moreover, Presidency College and the University attract many visitors from abroad and from other parts of India. It is shameful that they should see our central academic quarter treated with such neglect.

We believe the municipal, police and transport authorities include many of our loyal alumni. This is where they can do something for us within their own spheres, without even a reference to the college authorities. It would need very little money: only the determination that our premier seats of learning, and the youth who attend them, must be housed in something a little better than a dump.

Editorial

Let the fools rage, I swerved in naught,
Something to perfection brought ;
But louder sang that ghost, 'What then ?'

The latest idea about Presidency College that has captured the imagination of Calcuttans—and already become a cliche—goes something like this : the grandeur of the myths and legends surrounding Presidency is undeniable, but a rapid deterioration in standards has completely eroded the value of its exceptional tradition, and now one can only look back in wonder. If only it were so simple ! When we entered college we were warned about illusions. Most of them crumbled soon enough. It did not really take long to perceive that the apathy in the air was actually seeping out of the cracks in the walls. To the Presidentian, however, it is clear that what the college is asking for today is not to be abandoned, but to be rescued : for Presidency, to all of us, is home—choked with dust, disillusionment and turmoil perhaps, yet curiously and inexplicably precious.

In recent months, the college has been constantly in the public eye. Now that the murmurs of its discontent are beginning to be heeded, it is upto Presidentians past and present to try and replace what the college has lost. For all is not lost. Life within the college continues to thrive, albeit at its own pace and sometimes somewhat aimlessly. Right now, there are problems in almost every sphere of its existence. It seems as if efforts are being made to do away with Presidency's future. All external threats to its position must be removed, and the potential that its student-body is still quite justly known for must be given due recognition.

It is not as if our society has not conceded to the college the respect it could demand, though the concession has been somewhat grudging at times. More important, I think, is Presidency's most valuable possession, its continued ability to inspire devotion through generations of teachers and students. There are very few old students of the college, indeed, who do not recall their Presidency connexion with pride and love, and this in itself can be considered an achievement in an age where 'elitism' is misunderstood and much abused. Of course 86/1 College Street is no paradise, but neither is it Calcutta's wasteland—'a heap of broken images'—as many would like to believe.

The possibilities for self-criticism are endless, and indeed it is time for honest where-exactly-do-we-stand analyses. All that I am saying is that we need not get carried away by this relatively new line of thought. On the contrary, we could supplement this ego-destruction with a bit of constructive thinking. To retain its place in the sun, Presidency must face a number of challenges in the immediate future.

In other words, it is time to pause. Let us stop and think, re-evaluate and re-define. Let us draw upon traditions as well as the new life that constantly flows into the college, to re-build and re-juvenate. The fires of hope have already begun to burn. With a new and more ambitious colour-scheme for the college

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : एक सर्वेक्षण

संजय राय

आधुनिक हिन्दी-साहित्य में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। शुक्ल जी ने अपने साहित्यिक प्रतिमानों के माध्यम से संपूर्ण हिन्दी-साहित्य को परखने का भगीरथ प्रयत्न किया। शुक्ल जी के रूप में हिंदी को एक ऐसा प्रतिभाशाली लेखक मिला, जिसमें गंभीर विचारक सशक्त शैलीकार और एक महान निबंध लेखक का मिश्रण था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जिस आधुनिक-साहित्य के पौधे को लगाया और द्विवेदी जी ने जिसे खींचा, उसे शुक्लजी ने चतुर माली की तरह काट छाँट कर, सजाकर बड़ा किया। इस प्रकार हिंदी-साहित्य को भारतेन्दु जी से नवीन भाव, द्विवेदी जी से भाषा-संस्कार और शुक्ल जी से विवेकशील बुद्धि मिली।

हिन्दी-साहित्य के इतिहास-द्रष्टा :—

आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास की विधायिका शक्ति लेकर अभ्युदित हुए। हिंदी-साहित्य को शुक्लजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उनका 'हिंदी साहित्य का इतिहास' है। 'शब्द-सागर' की भूमिका के रूप में ही इस ग्रन्थ की रचना हुई। शुक्लजी के पूर्ववर्ती इतिहास-ग्रन्थों में न तो हिंदी-साहित्य का तर्क-संगत काल-विभाजन है और न ही विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक राजनीतिक परिस्थितियों तथा काव्यगत-प्रवृतियों की ही विवेचना है। अतः इन ग्रंथों को साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता। शुक्ल जी प्रथम साहित्येतिहास लेखक हैं, जिन्होंने इस तथ्य को पहचानने का प्रयास किया है कि 'आदि से अंत तक जनता की इन्हीं चित्त वृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास' कहलाता है।'

हिन्दी साहित्य का इतिहास' लिखकर शुक्लजी ने एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की। शुक्लजी का लिखा हुआ इतिहास सबसे पहला और सबसे उत्कृष्ट ग्रन्थ है। हिन्दी-साहित्य पर लिखे गए समस्त इतिहास ग्रन्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल-विभाजन प्रायः साहित्यिक प्रवृत्तियों के ही अनुरूप है। विभिन्न युगों की साहित्यगत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर ही शुक्लजी ने अपना काल-विभाजन किया है। यह काल-विभाजन इतना तर्क संगत और प्रमाण युक्त है कि प्रायः सभी विद्वानों को यत्किंचित् मतान्तरों के साथ यही ग्राह्य एवं स्वीकार्य है।

शुक्ल जी ने अपने इतिहास-ग्रंथ में साहित्यिक-प्रवृत्तियों का तो विवेचन किया ही है, साथ ही साथ साहित्यकारों की संक्षिप्त तथा मार्मिक आलोचना भी की है। शुक्लजी ने अपने इतिहास में उस समय की सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को केन्द्र में रखकर, उन पर पड़ते हुए प्रभावों के सन्दर्भ में साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रित सम्बन्धों का भी उद्घाटन किया है। इस प्रकार शुक्लजी का इतिहास-ग्रन्थ वर्णनात्मक न होकर, विवेचनात्मक है। समस्त ग्रन्थ रोचक और उदात्त शैली में लिखा गया

है। विवेचन की स्पष्टता तथा प्रमाणिकता की दृष्टि से यह इतिहास-ग्रन्थ वास्तव में अनुपम है। इन्हीं विशेषताओं से प्रभावित होकर आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी ने इस इतिहास ग्रन्थ को हिन्दी साहित्य की 'एक प्रतिनिधि रचना' कहा है।

नव शास्त्रीयता वादी समीक्षा के पुरोधा :-

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने युग की सीमा में एक निरपेक्ष और निस्संग आलोचक थे। शुक्लजी की आलोचनात्मक कृत्तियाँ साम्प्रतिक सुधी साहित्यकारों एवं पाठकों के लिये आलोक-स्तम्भ है। वह हिन्दी के पहले-पहल आलोचक थे, जिन्होंने हिन्दी को एक बौद्धिक आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान की। फलतः आज हिन्दी-आलोचना किसी भी देश के समुन्नत आलोचना साहित्य के समकक्ष बैठने की क्षमता रखती है। उनकी आलोचना युग-संधि की आलोचना है। शुक्लजी ने अपने पूर्ववर्त्ती आलोचकों की विशेषताओं का समन्वय करते हुये गम्भीर अध्ययन और मनन द्वारा उपार्जित अपनी मार्मिक दृष्टि से एक नयी आलोचना पद्धति को जन्म दिया। यह पद्धति संस्कृत के साहित्य शास्त्र पर आधारित है, पर पश्चात्य आलोचना शास्त्र द्वारा उनका परिमार्जन किया गया है। इसमें प्रधानता विवेचना और विश्लेषण की है, पर साथ ही प्रभावात्मक तत्व को भी उचित स्थान दिया गया है। इतिहास और मनोविज्ञान का भी यथेष्ठ सहारा शुक्ल जी ने लिया है। आलोच्य कृति के साथ-साथ कृतिकार के देशकाल और समाज के अध्ययन को भी उन्होंने आवश्यक माना है। शुक्ल जी ने आलोचना के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों को अपनाया है। उन्होंने साहित्य संबंधी सिद्धांत भी स्थिर किये हैं और इन सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए अनेक कवियों और रचनाओं की विवेचना भी की है। शुक्लजी की रचनाओं में रोचकता का भाव भी रहता है। इस गुण को लाने के लिये उन्होंने मृदुल हास्य और प्रच्छन्न व्यंग्य से भी काम लिया है, जो अत्यन्त ही चुभते ढंग के हैं।

आचार्य रामचंद्र शुक्लजी की आलोचना प्रणाली का एक विशेष गुण यह है कि वह आलोच्य विषय पर पहले साधारण सैद्धांतिक कथन कर देते हैं, इसके उपरान्त वह उस सिद्धांत का व्यावहारिक घटन कवि-कृति पर सिद्ध करते हैं। शुक्लजी की आलोचनाओं में शास्त्रीय दुरुहता नहीं दीखती। उसकी जगह उन आलोचनाओं में सहृदयता मिलती है। उनमें जगह-जगह पर ऐसे कथन मिल जाते हैं, जिनसे शुक्लजी की रसिकता, हास्य-प्रियता और विनोद शीलता टपकती है।

शुक्लजी ने आलोचना-सम्बन्धी, जो सिद्धांत तथा आदर्श स्थापित किये थे, उनका क्रियान्वित रूप हमें उनकी तीन सुप्रसिद्ध आलोचनाओं में मिलता है, जो सूरदास, तुलसीदास और जायसी पर लिखी गई है। ये आलोचनाएं हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि हैं मौलिक विद्वतापूर्ण, मार्मिक और गंभीर होते हुए भी ये स्पष्ट और सुगम हैं।

अस्तु: हिंदी आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी निस्संदेह हमारे आदर्श एवं पथ-प्रदर्शक हैं। उन्होंने हिन्दी में एक गंभीर, बुद्धिवादी आलोचना-शैली निर्मित की और उसकी नींव अपने ठोस अध्ययन और मनन पर रखी, जिसे आधुनिक समीक्षक नव शास्त्रीयतावादी समीक्षा-पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं।

निबन्ध कला की कसौटी पर :—

निबन्ध के क्षेत्र में गूढ़ विवेचना और सूक्ष्म विश्लेषण लाने का सर्वप्रथम तथा सर्वप्रमुख श्रेय शुक्ल जी को ही है। शुक्ल जी के विषय में कहा जाता है कि उनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। निबन्ध साहित्य के विकास में इन तीनों का समन्वय ही शुक्ल जी का अमूल्य योगदान है। हृदय की सरलता, बुद्धि की अखरता, वैज्ञानिक विश्लेषण एवं सूक्ष्म पर्यालोचन-दृष्टि तथा अध्ययनशीलता के समावेश द्वारा उन्होंने निबन्ध साहित्य को एक प्रकार से पूर्णता प्रदान की और उसका मार्ग भी प्रशस्त किया। शुक्ल जी निबन्ध की ऐसी गूढ़, गुम्फित शैली चाहते थे, जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित हो सके। वह शुद्ध विचारात्मक निबन्ध का चरम उत्कर्ष वहीं मानते थे—"जहाँ एक-एक पैराग्राफ में विचार दबा-दबाकर कसे गये हों और एक-एक वाक्य किसी सम्बन्ध विचार-खण्ड को लिये हों।"

शुक्ल जी के निबन्धों में से कुछ निबन्ध मनोवैज्ञानिक हैं और कुछ शुद्ध साहित्यिक हैं। साहित्यिक निबन्धों में कुछ सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी हैं और कुछ व्यावहारिक आलोचना से सम्बन्धित। उनके मनोवैज्ञानिक निबन्ध भी साहित्यिक ही हैं, क्योंकि उनमें प्रायः उन्हीं वृत्तियों का विवेचन हुआ है, जिनका साहित्य में वर्णन मिलता है। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबन्ध जहाँ एक ओर रस शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वहीं साहित्यिक दृष्टि से भी वे उत्कृष्ट ठहरते हैं। शुक्ल जी ने भावों एवं मन के विकारों पर विचार किया है। उत्साह, श्रद्धा-भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा ईर्ष्या, भय और क्रोध इत्यादि भाव एवं मनोविकार विषयक निबन्ध हैं। मनोविकारों पर तर्कमय चिन्तन के साथ हिन्दी में प्रथम बार ये निबन्ध लिखे गये हैं। सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य में 'बेकन' ने मनोविकारों पर विचार किया था; किन्तु जितनी पूर्ण विवेचना शुक्ल जी के निबन्धों में है, उतनी बेकन के निबन्धों में कहाँ ?

सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्धों में 'कविता क्या है; 'साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्यवाद' 'रसात्मक बोध के विविध रूप और काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था' ये चार निबन्ध आते हैं। यदि प्रबन्ध और निबन्ध के भेद को अस्वीकार कर दिया जाए तो 'काव्य में प्राकृतिक-दृश्य' काव्य में रहस्यवाद' और 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' इत्यादि तीन प्रबन्ध भी सैद्धान्तिक-समीक्षा-सम्बन्धी निबन्धों में आते हैं। 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' 'तुलसी का भक्ति मार्ग' और 'मानस की धर्मभूमि' आदि व्यावहारिक समीक्षा-सम्बन्धी निबन्ध हैं। गोस्वामी तुलसी दास के सम्बन्ध लिखित आलोचना-ग्रन्थ वस्तुतः स्फुट निबन्धों का ही संकलन है। जायसी-ग्रन्थावली' की भूमिका में सम्मिलित 'पद्मावत् की प्रेम पद्धति' एवं 'जायसी का विरह वर्णन' भी व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी निबन्ध ही हैं। 'भ्रमर-गीत-सार' की भूमिका के रूप में 'सूर पर शुक्ल जी की आलोचना भी, जिसे 'प्रबन्ध' कहा जाता है, इसी कोटि में रखी जा सकती है।

चिंतामणि' के निबन्ध विविध भावों के स्वरूप का विश्लेषण करने वाले वैचारिक निबन्ध हैं, जिसमें मनोविज्ञान और दर्शन के तत्वों का निश्चय ही सन्निवेश हो गया है तथापि ये निबन्ध साहित्यिक

मर्यादा से स्खलित नहीं हुए और न नीरस या शुष्क यह तो निबन्धकार की विशिष्टता ही है कि उन्होंने भावों का विश्लेषण करते हुए कहीं तो उसी में अन्तर्व्याप्त सौन्दर्य तथा लालित्य को अथवा कहीं आनुषंगिक विषयान्तर को लाकर निबन्ध की सरसता अक्षुण्ण बनाए रखी। ऐसे निबन्धों में आवेगात्मक रसवत्ता के स्थान पर बुद्धिरस' की प्रमुखता है, तथापि किसी या तत्व के विश्लेषण में सर्वथा सौन्दर्य या लालित्य का अभाव हो, यह मानना अनुचित ही है। शुक्ल जी के निबन्धों में बुद्धि और हृदय का मणि कांचन संयोग मिलता है। स्वयं शुक्ल जी ने भी कहा है—"इस पुस्तक में, ('चिंतामणि' में) मेरी अन्तर्यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिये निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है।'

साहित्य-दर्शन की भूमिका पर :

शुक्ल जी कला में लोक-कल्याण की भावना प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वह 'कला कला के लिए' सिद्धांत के विरोधी थे। अपनी लोक-भावना लोकोत्तर कल्याण की भावना है और परलोक मुखी है। उन्होंने काव्य और कला को लोकोत्तर तथा शुद्ध कला के लिये मानने वालों को, तथा रसको 'रसोवै सः' तथा "रक सारः चिदानन्द प्रकाश" आदि कहने वाले समीक्षकों को, मिथ्या सिद्ध करते हुए अपने अद्भुत बौद्धिक तर्कों द्वारा यह प्रतिपादित किया कि काव्य-सर्जना इसी लोक से अनुप्राणित होती है और इसी लोक के लिए की जाती है। उसका प्रयोजन किसी आध्यात्मिकता अथवा किसी इतर लोक की अनुभूति प्राप्त करना नहीं है। आचार्य शुक्ल ने काव्यगत-सौन्दर्य को भी पाश्चात्य सौन्दर्य शास्त्रियों, ही गोल और कण्ट की तरह, निष्प्रयोजन निष्प्रमेय न मानकर उसे सप्रयोजन और सापेक्ष निरूपित किया है तथा उसे गत्यात्मक रूप प्रदान कर उन्होंने सौन्दर्य को लोक जीवन के अधिक निकट लाया है। शुक्ल जी का काव्यगत सौन्दर्य तो कर्म और मनोवृत्ति को उभारने वाला सौन्दर्य है, वह मंगल का पर्याय है तथा वह बायवी या आध्यात्मिक सौन्दर्य नहीं है। शुक्ल जी ने काव्य के भाव और विभाव दोनों पक्षों को इस अनन्त रूपात्मक जगत के प्रति, व्यक्ति मानस की प्रक्रिया स्वरूप ही माना है। वे बर्गसाँ और बर्कले को दार्शनिक चिन्ताओं से अनुप्राणित होकर विलियम ब्लैक ब्रैडले आदि को भाँति कल्पना के किसी प्रथम लोक की सत्ता नहीं मानते और न ऐसी किसी सत्ता में विश्वास ही प्रकट करते हैं। 'विश्व-प्रपंच' की भूमिका में उन्होंने धर्म को 'निःश्रेयस' से अधिक 'अभ्युदय' के रूप में स्वीकार किया है।

और कवि भी :

आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार, विचारक और निबन्धकार थे। इसके अतिरिक्त वह एक सहृदय कवि भी थे। इस क्षेत्र में उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना ब्रजभाषा में अनूदित 'बुद्धचरित' है, जो आर्नल्ड के 'लाइट ऑफ एशिया' का अनुवाद होते हुए भी मौलिक काव्य की विशेषताओं से युक्त है। शुक्ल जी ने खड़ी बोली में भी अनेक कविताएँ लिखी हैं, जिनमें 'आमन्त्रण' और 'हृदय का मधुर भार' विशेष प्रसिद्ध है। मौलिक रचनाओं में शुक्ल जी का प्रकृति-चित्रण अत्यन्त मनो-

रम तथा प्रभावशाली है। वस्तुतः साहित्य का आचार्यत्व करते हुए शुक्ल जी ने अपनी कवित्व प्रतिभा का भी प्रभूत निदर्शन किया है। उनकी मौलिक कविताओं का संग्रह "मधु स्त्रोत" के नाम से संकलित एवं प्रकाशित है, जिसमें शुक्ल जी की रस दृष्टि और मुक्तकला इन्द्रधनुषी प्रति-छवियों में प्रतिबिम्बित है।

वस्तुतः आचार्य शुक्ल के 'मधुस्त्रोत' में उनकी काव्य प्रतिभा के दर्शन मूलतः एक सुधारवादी कवि के रूप में ही होता है, जिसमें 'भारतदुर्दशा' 'फूट' और अन्यान्य कविताओं में अपनी राजनीतिक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति हुई है। 'मधुस्त्रोत' की अधिकांश कविताएँ ग्राम्यजीवन, सामाजिक समस्या, धार्मिक मिथ्याडम्बर और प्रकृति-सौन्दर्य से सम्बन्धित हैं, जिसमें शुक्ल जी की प्रगतिशील विचार-धारा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उन कविताओं में ब्रिटिश सामाज्यवाद, भारतीय पूंजीवाद और प्रति क्रियावादी तत्वों द्वारा वर्ग-शोषण तथा आर्थिक विषमता के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी विचारों की अभिव्यक्तियाँ हुई हैं।

काव्य शिल्प की दृष्टि से शुक्ल जी की काव्य शैली में छायावादी तत्वों का भी समावेश हुआ है, जिनका उन्होंने स्वयं ही विरोध किया था। कहा जाता है कि शुक्ल जी अपनी कविताओं में अपने 'भोले-भावा को प्रकट करके संतुष्ट हो जाते हैं, किन्तु उनके काव्य-शिल्प में प्रसाद के काव्य बोध और मैथिली शरण गुप्त की काव्य-शैली का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि उनमें निराला के भावावेग का भी निदर्शन होता है। अतएव डा० रामविलास शर्मा की धारणा है कि—'शुक्ल जी की कविताएँ पढ़ने का एक अकाव्यात्मक आनन्द यह है कि उनमें अनेक कवियों की प्रतिध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं। कविताएं क्या हैं, हिंदी कविता के विकास का अप्रत्यक्ष इतिहास है।'

PRESIDENCY COLLEGE

'निराला', अथच तुलसी

नमिता सांगानेरिया

निराला की चेतना संस्कृति के जागरूक कवि, अध्यात्म के उद्गायक और क्रान्ति के उद्गोता के शत-शत स्वरों में अपना रूप बिखराती रही है। स्वामी विवेकानन्द की भाँति देश-भक्ति, जनसेवा, मानव-कल्याण और कर्म-योग में उनकी चरम आस्था थी। स्वामी विवेकानंद से आध्यात्मिक दृष्टि, 'रामकृष्ण-मिशन' से अद्वैतवादी चिन्तन तथा गांधी और तिलक से विद्रोह की भावना लेकर निराला की राष्ट्रीयता अंकुरित हुई। तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन की विषमता, अतीत के उज्ज्वल वैभव की गरिमा और भविष्य की मनोहारिणी कल्पना ने उनकी चेतना को गतिशील बनाया था। वर्ग चेतना का भाव उनमें विद्यमान था, पर उसका आधार भारतीय जीवन व्यवस्था ही थी, न कि यूरोपीय औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। यह कुछ तो अवध की मिट्टी का पारिवारिक संस्कार था और कुछ महिषादल में किसान और भूमिपतियों के संबंध की जटिलताओं से अर्जित अनुभवों का परिणाम।

निराला एक ऐसे कवि हैं, जिनके जीवन और काव्य में संबंध का स्वरूप घनिष्ट ही नहीं बल्कि अद्वट है। इनके जीवन का एक-एक अनुभूत क्षण इनकी कृतियों में झलकता है। ..... इनका व्यक्तित्व और काव्यत्व दो विपरीत धाराओं का संगम है, सम एवं विषम स्वरों की रचना है।' यह धारणा मात्र डॉ० इन्द्रनाथ मदान की ही नहीं है, वरन् स्वयं निराला भी घोषणा करते हैं, 'मैंने अपनी कृतियों में अपने जीवन को लिख दिया है। जाकर मेरी सभी कृतियाँ खरीदकर पढ़ो, स्वयं मालूम हो जायगा कि मैं क्या हूँ।'

निराला की महत्वपूर्ण कृति 'तुलसीदास' का असाधारण व्यक्तित्व सम्पन्न नायक तुलसी अपने युग के इतिहास पर नव दृष्टिकोण से विचार करने वाले, राष्ट्रव्यापी चेतना का प्रसार करने वाले महान लोक नायक हैं। लोक-कल्याण और सत्य की पुनरस्थापना के लक्ष्य से युक्त तुलसी आत्म-मुक्ति से लोक-मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। 'कवि निराला का जन्म भी तुलसी-संस्कृति के भीतर से हुआ था। तुलसीदास में निराला के व्यक्तित्व का आत्मनेपद लिखा है।

—डॉ० रमेश कुंतल मेघ

'तुलसीदास नामक काव्य मे कथानायक तुलसी के अध्ययन, अभिरूचि, स्वास्थ्य, स्वर, धीर-गम्भीर स्वभाव की चर्चा प्रकारान्तर से निराला की उस व्यक्तित्व सम्पन्नता के ही चित्र हैं, जिसके लिए डॉ० दीनानाथ शरण' ने कहा था—"लम्बा-चौड़ा बलिष्ठ शरीर, लम्बे-लम्बे केश और प्रभावपूर्ण मुख मंडल—सब मिलाकर उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सामर्थ्यवान

है ... ... ", जिसमें किसी को अपोलो के दर्शन हुए किसी को जुलियस सीजर के।

डा० बच्चन सिंह 'मनु के लिए कही गयी प्रसाद की पंक्तियों में निराला को ही देखते हैं—

अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ
ऊर्जस्वित था वीर्य अपार
स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्त का
होता था जिनमें संचार।

लगता है—'गत-भय, 'अपने प्रकाश में निःसंशय' निराला अपने बहुमुखी व्यक्तित्व के लिए स्वयं ही कहते हैं—

"देखते नहीं, मेरे पास कवि की वाणी कलाकार के हाथ पहलवान की छाती और फिलॉसफर के पैर हैं।"

तुलसी के व्यक्तित्व परिचय के साथ मानो स्वयं निराला ही कविता में उतर आते हैं। वहाँ वे एक तटस्थ द्रष्टा व वर्णनकर्ता ही न रह कर उसमें शामिल और सक्रिय भी हो जाते हैं। "... वे तुलसी के रूप में पूरी कथा में विद्यमान हैं। सांस्कृतिक चिन्ता का उत्तराधिकार 'तुलसी' को सौंपकर स्वयं उसमें समाहित हो जाते हैं" —डा० दूधनाथ सिंह

'तुलसीदास के तुलसी शास्त्र विद् और समधीत होने के साथ ही देश-काल समाज के दुःख 'शर से घायल कवि हैं। उनका छटपटाता हुआ मन अपनी संवेदना की इन भूमियों को रचनात्मकता से तिरोहित नहीं होने देता और सदियों से प्रताड़ित दलित निम्न वर्ग को इस रचनात्मकता में स्थान मिलता है—

रण के अश्वों से शस्य सकल
दलमल जाते ज्यों दल के दल
शूद्रगण क्षुद्र जीवन सम्बल पुर पुर में।

'ताड़न के अधिकारी' कहने वाले की यह संवेदना, यह मानसिक बनावट 'रामचरित मानस' के रचयिता तुलसीदास की नहीं है, अपितु निराला के 'तुलसीदास' के तुलसी की है। इसके माध्यम से निराला के रचनात्मक आयाम का उद्घाटन होता है। इसके पीछे निराला की वह वेदना क्रिय है, जो कालांतर में 'भिक्षुक' के रूप में सामने आई थी। यहाँ वह आक्रोश सक्रिय है, जिससे प्रेरित होकर निराला ने कहा था—"इसलिए तोड़कर फेंक दीजिए जनेऊ, जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं, जो बड़प्पन का भ्रम पैदा करता है और समस्वर से कहिए कि आप उतनी ही मर्यादा रखते हैं, जितनी आपका नीच से नीच पड़ोसी चमार या भंगी रखता है, तभी आप महा मनुष्य हैं ..."

ऐसे तुलसीदास को प्रकृति चित्रों के माध्यम से भारतीय जन-जीवन व संस्कृति की दुर्दशा का तीव्र बोध होता है और तभी वे सम्पूर्ण जड़-संस्कृति के प्रस्तरीभूत भारतीय मेधा को उसके प्राचीन गौरव, पुरातन सुन्दरता और पवित्रता से पुनः सम्पन्न कराने की प्रतिज्ञा करते हैं—अपनी वाणी को वर्चस्वता द्वारा:

करने को ज्ञानोद्धत प्रहार
तोड़ने को विषम बज्र द्वार
उमड़े भारत का भ्रम अपार हरने को

इस तुलसी की तुलना। उस निराला से की जा सकती है, जो जीवन के अपने लक्ष्य का परिचय इस प्रकार देते हैं—"मैं निराला बनूँगा। जब मैं कविता पाठ करूँगा, तो अनुभूतियों की सामूहिक वर्षा होने लगेगी। ... इसलिए भी निराला बनूँगा, क्योंकि देश अभी गरीब है; और अधिक दयनीयता का वरण आज के भारतीय साहित्यकारों को सिर्फ

श्रेयस्कर ही नहीं; वरन् अनिवार्य भी है। तभी तो जनता का प्रतिनिधि साहित्य-स्रष्टा बन सकूँगा।"

ऐसे तुलसीदास की प्रेरक शक्ति 'रत्नावली' के चित्रण के मूल में संभवतः निराला की स्वकीया मनोहरा देवी हैं, जिसके लिए स्वयं निराला स्वीकार करते हैं 'हमारी साहित्य साधना के मूल में तो मनोहरा देवी का पूर्ण योग है। जो कुछ भी सफलता मिली वह उन्हीं के कारण थी; नहीं तो मैं तो हिन्दी जानता भी न था।" निराला के यह कहने पर कि "तुम हिन्दी-हिन्दी कहती हो, हिन्दी में क्या है?" उन्होंने कहा—"तुम्हें जब आती नहीं, तो कुछ भी नहीं है तुम खड़ी बोली का क्या जानते हो?"

'रत्नावली के कारण ऐसे मानस' का सृजन हुआ, जिसमें औदात्य था, गरिमा थी जो मध्यकालीन मृत भारतीय संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने का शक्तिशाली अस्त्र सिद्ध हुआ। दूसरी ओर मनोहरा देवी के कारण हिन्दी को केशव जैसे अगाध पाण्डित्य पूर्ण और कबीर के समान निर्भीक आत्माभिमानी कवि निराला मिला जिसने "मनुष्यता पर विश्वास नहीं खोया,..... " अपने आदर्श विश्वास नहीं खोए .... अपने व्यक्तित्व और व्यक्तिसाधना के बल पर काव्य में सामंजस्य देखा। यह सामंजस्य की भूमिका मानवतावादी स्तर पर है, मानव जीवन की आस्था पर निर्मित है।'

— आ० नन्द दुलारे वाजपेयी

পরিচিতি

অচিন্ত্য কুমার মুখোপাধ্যায়।	অধ্যক্ষ।
সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত।	প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ।
সুকান্ত চৌধুরী।	ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক এবং এ সংখ্যার অন্যতম ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। কলেজে জনপ্রিয় শিক্ষকদের অন্যতম। ছাত্রাবস্থায় লেখা বই থেকে জানা যায় তাঁর শখ ছিল কবিতা লেখা ও পাখী দেখা। বর্তমানে বিশ্ব শেকস্‌পীয়র কংগ্রেসের একটি বিভাগের সভাপতিত্ব করতে ব্যস্ত।
গৌরীশংকর ঘটক।	অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং এ সংখ্যার অপর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। ছাত্রদের রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে ভাবনাচিন্তা করেন।
প্রশান্ত রায়।	রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। সমাজতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেছন।
বার্ণিক রায়।	ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ রায়। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। আধুনিক কবি হিসেবে খ্যাত।
প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত।	বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। কলেজে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ভালো করার জন্য ছাত্রদের যে কোন সৃজনশীল কাজে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন।
ধ্রুব গুপ্ত।	প্রাক্তন ছাত্র। নেশা চিত্র সমালোচনা, অবসর সময়ে অধ্যাপনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ।
মালিনী ভট্টাচার্য।	অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন ছাত্রী।
বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।	কলেজ গ্রন্থাগারের প্রবীনতম গ্রন্থাগারিক।
সৌম্য দাশগুপ্ত।	'প্রথমেতে করো এসে সন্দেহ ভঞ্জন / সৌম্য না তথাগত সই নেবে কোন্ জন।' রাশিবিজ্ঞান প্রথমবর্ষের উঠতি কবির প্রতি এই হ'ল শঙ্খ ঘোষের ঘোষণা। এর মধ্যেই 'দেশে' নিয়মিত কবিতা লিখছেন। তবে প্রথমবর্ষীয় ছাত্রীরা 'তথাগতদা' বলায় একটু বিচলিত। কবিতা বুঝিয়ে দিতে বল্‌লে ভীষণ রেগে যান। খবর আছে ছাত্র সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদকটি মাঝে মধ্যেই দুর্গাপুর ছোটেন। এবং ফেরেন বেশ তরতাজা হয়ে।
অভিজিৎ দত্ত।	মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কাবতার চাষ করেন। কলেজের চলচ্চিত্র সংসদের সম্পাদক। বন্ধুমহলে 'পাটালি' নামে পরিচিত। লজ্জা পেলে নিজস্ব ভঙ্গিমায় জিব কাটার অভ্যেস আছে। ইকনমির সার্থক ছাত্র, বিদায়ী ৩য় বর্ষ।
অনির্বাণ ময়ূখ সেনগুপ্ত।	দাড়ি-চশমা-পাজামা-পাঞ্জাবী থাকলেও বাংলা বিভাগের কেউ নন। সরল দোল গতিতে চলাফেরা করেন। মাতৃভাষা পদার্থবিদ্যা।
অসীম রতন ঘোষ।	সীমার মাঝে অসীম তিনি প্রেসিডেন্সির ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যেও আত্মপরিচয় গোপন রেখেছেন। ভূতত্ত্ব বিভাগ তৃতীয় বর্ষ।

অমিত চৌধুরী।	টাইফয়েড থেকে ওঠার পর নিয়মিত বেনামী চিঠি পাচ্ছেন। ফলে নিয়ম করে দাড়ি কামাচ্ছেন। নিয়ম করে বিকেলে গড়িয়াহাটের কোন এক রেস্তোরায় বসছেন। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদককে নিয়মিত ক্যান্টিন ও ইউনিয়ন রুমে পাওয়া যাচ্ছে। কেবল পদার্থবিদ্যার তৃতীয় বর্ষের ক্লাসেই অনিয়মিত।
উদয়ন মিত্র।	কলেজে নির্দিষ্ট বুট ধরে চলাফেরা করেন। ইংরেজী তৃতীয় বর্ষে পড়াশুনো করছেন। অবসরে সোমনার ঘরের টেবিলে হাতাপাখা দিয়ে টিটি খেলে থাকেন। এর সম্পর্কে হাতে আর কোন তথ্য নেই।
সুহিত কুমার সেন।	কখনো কখনো ক্লাসে বেশীর ভাগ সময় ক্যান্টিনে পাওয়া যায়। কিন্তু কথা বলেন খুব কম। হঠাৎ একবার লিবিয়া নিয়ে ক্যান্টিনে সোচ্চার হয়েছিলেন। কারণ কি ? ইতিহাস তৃতীয় বর্ষ।
শ্রীমতি বসু।	রেগে গেলে ইংরেজীতে জার্মান বলেন। আপতত ছাত্র ঠ্যাঙ্গাতে ব্যস্ত। বন্ধু তো,নন্দীমশাই-এর পাণিগ্রহণ করলে কী হত ?
কিংশুক মিত্র।	প্রকৃতিতে প্রকৃতই প্রকৃতি প্রেমিক। একবার সাপ একে কামড়ে বিপদে পড়েছিল। ডাকনাম ব্যাঁকা, মাকড়সার ছবি তুলে নাম কিনেছেন। অর্থনীতি তৃতীয় বর্ষ।
কৌশিক নাগ।	রাজনীতিতে কথা কন। সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থন করেন যদিও রাতে 'মোশার' ভয়ে মশারী খাটাতে কখনও ভোলেন না। একবার কলেজে সেলাই এর বদলে স্টেপলার লাগানো প্যান্ট পরে এসেছিলেন। শারীরবিদ্যা বিদায়ী তৃতীয় বর্ষ, সুনিশ্চিত নয়।
উদয়ন মজুমদার।	উদো নামে বেশী পরিচিত। মুখ কম খুললেও হংরেজী লেখা ও ব্যাডমিণ্টনের ড্রপসটে হাত পাকিয়েছেন। শোনা যায় কফি হাউসে অপেক্ষারত কোন এক বান্ধবীর ভয়ে হস্টেল ছেড়ে একবার পালিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বিভাগ বলাবাহুল্য ইংরেজী।
কৃত্তিবাস রায়।	উত্তরাধিকার সূত্রে অনাবিল হাস্যরসের উৎস। নিজেকে কবি ভাবার স্বভাব আছে। তাই পড়ন্ত বিকেলে ক্লান্ত বন্ধুদের কাছে এসে মোলায়েম গলায় বলে থাকেন—আয় কফি খাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দ্বিতীয় বর্ষ ; নিরাপদ দূরত্বে থাকুন।
ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী।	ডাক নাম সোন্ত। মন্দ লোকে বলে, হীন নাম ছাপানোর যেকোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকেন। 'দি প্রোসডোন্সয়ানস্ অফ ঢুডে' সার্ভে রিপোর্টে সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপিয়েছেন। এখন কলেজের চলচ্চিত্র সংসদের ম্যাসিক বুলেটিনের সম্পাদক হিসাবে নিয়মিত নাম ছাপিয়ে চলেছেন। না বললেও চলে তিন বছর পূর্বেই রাশিবিজ্ঞান বিভাগের রেজিষ্ট্রারে নাম ছাপিয়েছেন।
সঞ্জয় রায়। নমিতা সাংগানেরিয়া।	সম্পাদকদের সঙ্গে ব্যাক্তগত পরিচয় নেই। কাজেই এ'দের দুর্বলতাও জানা নেই। কেবল এটুকু জানা আছে দুজনেই হিন্দী বিভাগের।

নৈবেদ্য চট্টোপাধ্যায়। নিয়মিত নিমপাতা খাওয়া চেহারা। ঋতুচক্রের মতো রোগচক্র পালন করছেন সারাবছর। এ'র মধ্যে জটিল বাংলা বলা ও জটিলতর বাংলা লেখার ঝোক লক্ষ্য করা গেছে। এখন থেকেই ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন। শারীরবিদ্যা বিদায়ী তৃতীয় বর্ষ।

শম্পা সেন। সব অর্থেই স্বল্প ৩রঙ্গ দের্ঘ্যের মানুষ। এর বেশী জানতে হলে ব্যোমকেশকে ধরুন অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন—ঠিকানা বাংলা বিভাগ প্রথম বর্ষ।

সঞ্জয় মুখার্জী। ওজন ও ব্লাড গ্রুপ দেখে আজকাল বন্ধুত্ব করছেন এরকম জনশ্রুতি। ন্যাশনাল কুইজে কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবং সেজন্য প্রচুর ব্যক্তিগত চিঠি পাচ্ছেন।

সমীর রায়। ডাকনাম গুপী। নিজের ধাঁচে 'দ্রিঘাংচু'র ছবি এঁকে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বেশ সোজাপথেই চলছিলেন, এখন হঠাৎ দর্শনের দিকে ঝুঁকে গেছেন। পদার্থবিদ্যার বিদায়ী তৃতীয় বর্ষ।

বৃন্দা বসু। পরবর্তী সম্পাদকেরা এ'র কাছ থেকে জেনে নিন কীভাবে প্রেসের ত্রিসীমানায় না গিয়ে পত্রিকা সম্পাদনা করতে হয়। ইংরেজী বিভাগের বিদায়ী তৃতীয় বর্ষের জনপ্রিয় ছাত্রী। এখন থেকেই কাগজে লেখা বেরোচ্ছে।

অপূর্ব সাহা। ব্যাগে ইঁট ভরে ওজন ভাঁড়িয়ে রক্ত দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অল্প-বিস্তর কবি। বাংলা বিভাগের ছাত্র হওয়াই স্বাভাবিক।

শুভব্রত ভট্টাচার্য। 'দাদু' নামে সবাই চেনে, জানে ও মান্যি করে। চিনতে হলে সাদা শার্ট নীল প্যান্ট খেয়াল করতে হ'বে। মাঝে মধ্যেই গোঁফে তা দেন—পাছে চুরি হয়।

চান্দ্রেয়ী নিয়োগী। কথায় ওজন থাকলেও ওজন স্বল্পতার জন্য রক্ত দিতে পারেননি বলে দুঃখিত। বর্তমান সংখ্যার প্রকাশন সচিবের বামাচরণ ও বাগ জানতে হলে সার্ভে টিমকে জিজ্ঞেস করুন। ইংরেজি তৃতীয় বর্ষ।

সুদীপ্ত সেন। সুট পরা ও ভাল কবিতা লেখার জন্য কলেজে এখনও স্মরণীয়। প্রাক্তন ছাত্র ইংরাজি বিভাগ। সম্ভবতঃ স্নাতকোত্তর ছাত্র (?)।

স্বপন রায়। পকেট মারার স্বপ্ন দেখেন। হয়তো সেইজন্যেই 'পথিক' শব্দটির সঠিক সংজ্ঞা খুঁজতে আগ্রহী। প্রাণীবিদ্যা তৃতীয় বর্ষ।

অঞ্জন গুহঠাকুরতা। কলেজ পত্রিকার সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রেসে ঢুকে অনেক বাংলা বানান শিখলেন। চলচ্চিত্র সংসদের সম্পাদনা করেও পরোপকারে ব্যস্ত থাকেন। পরীক্ষায় অনেক অনেক নম্বর পান, কি করে তা কেউ জানে না।

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
PRESENTED
6 JAN 1987
CALCUTTA